নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

জুন ২০১৭ ■ জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় ১৪২৪

সৌজন্য সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশক
সন্তীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ফিরোজ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ
সুবর্ণা শীল
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এ বছরে দিবসটি উদযাপনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'প্রকৃতির বন্ধনে প্রাণের স্পন্দনে'। এই উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের পরিবেশ সচেতন করে তুলতে নবারুণ কি করেছিল, সে খবরটা আগে দেই। গত ১৯ মে ২০১৭ তারিখে নবারুণ পত্রিকা অফিস চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে আয়োজন করা হয়েছিল নবারুণ পরিবেশ সম্মেলন। সারাদেশ থেকে আসা নবারুণের খুদে লেখক ও আঁকিয়েদের এ মিলনমেলায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, প্রধান তথ্য কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দফতরের প্রধান নির্বাহীগণ, খ্যাতিমান লেখক ও শিশু-কিশোরদের অভিভাবকবৃন্দ।

পরে তথ্যমন্ত্রী অনলাইনে নবারুণ পত্রিকা পাঠের শুভ উদ্‌বোধন করেন। এখন থেকে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে এবং facebook.com/nobarunpotrikabd সাইটেও পত্রিকাটি পড়া যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের বাস্তবায়ন কী চমৎকারভাবে ঘটল, তাই না?

সুখবর আরো আছে। সীমিত জমি থাকলে বাড়ির ছাদেও বাগান তৈরি করা সম্ভব, এ কথা নবারুণ অনেকবারই বলেছে। এবার চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ছাদে বাগান তৈরি করে সে কথাকে কাজে পরিণত করা হলো। বন্ধুরা, তোমাদের বাড়ির ছাদ, জানালার কার্নিশ, ঘরের কোণে এক টুকরো বাগান গড়ে তোল। পরিবেশকে বাঁচাতে এ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো উপায়। আর কে না জানে, পরিবেশ বাঁচলেই বাঁচবে মানুষ, বাঁচবে প্রকৃতি। কেননা, প্রকৃতি আমার, আমি-ই প্রকৃতি। প্রকৃতি তোমার, তুমি-ই প্রকৃতি।

সূচি

নিবন্ধ

০৩ নবারুণ পরিবেশ সম্মেলন /শাহানা আফরোজ
০৬ বিপন্ন প্রকৃতি সংকটে পরিবেশ / মোকারম হোসেন
০৯ আমাদের গড়া পরিবেশ আইন / মোসাঃ তানিয়া আক্তার
১১ সাবধান!! ডিজিটাল বর্জ্য / মেজবাউল হক
২৩ ভূমিকম্প : প্রধানমন্ত্রীর ১৯ নির্দেশনা / সুলতানা বেগম
২৭ পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের অবদান / তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
২৮ পৃথিবীর বিস্ময় : বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু
ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
৫৪ ঈদ ধারাবাহিক 'ছোটকাকু' / সৈয়দ মহিদুর রহমান

গল্প

২৪ নেপালি বন্ধু উথান / মিজানুর রহমান মিথুন
৩৬ সজল ও সবুজের গল্প / সৈয়দা নাজমুন নাহার
৩৮ মেঘ গাছেরা / সাইদুস সাকলায়েন
৪০ নদীর জন্য ভালোবাসা / জসীম আল ফাহিম
৪৩ মশা ও মানুষের বৈঠক / আরিফুন নেছা সুখী
৪৭ শিলুদের ব্যালকনি / দিলারা মেসবাহ
৪৯ বুবলির গল্প / মালেকা পারভীন
৫১ নীলিমার জন্য উপহার / বিন্দু সাহা

কবিতাগুচ্ছ

১০ ফারুক নওয়াজ
২৬ বেণীমাধব সরকার
৩৫ আমিরুল হক
৩৯ দুষ্টু বাঙাল / রেবেকা ইসলাম
৪২ স্বপন মোহাম্মদ কামাল
৪৪ ওয়াহিদুজ্জামান / মনসুর আজিজ / মিলি হক
৫২ সরদার আবুল হাসান / রেজিনা ইসলাম / বোরহান মাসুদ
৫৩ এমরান চৌধুরী / জাকির হোসেন চৌধুরী
এস এম শহীদুল আলম

সাফল্য

৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ / সাদিয়া ইফফাত আঁখি

ছোটোদের লেখা গল্প

১২ পদ্মা নদীর গল্প / মীম নোশিন নাওয়াল খান
১৪ নবারুণ-এর দেওয়া গাছটি / মারজুক আব্দুল্লাহ
১৫ বন্ধুর ছায়া / অর্ঘ্য দত্ত
১৭ ঐশির গাছ / লাবিবা তাবাসসুম রাইসা
১৯ মাকড়ি / সারা হোসেন সামান্তা
২০ গাছের নাম পতাকা / সামিহা তাসনিম সিনহা
২১ জায়গা বদল / চান্দ্রেয়ী পাল মম
২২ লেবুচাঁদ এবং স্বপ্ন / এ. এইচ.এম. মুনাইমুল আজম
৩৪ গাছ বন্ধুদের উপহার / জয়িতা পাল সিথি
৩৫ পরিবেশবান্ধব উপহার / সাদিয়া তাসনিম মোহনা
৫৫ একজন অন্যরকম বন্ধু / ফাইয়াজ কবির মুগ্ধ
৫৬ কামিনী গাছ ও কবুতর / নবনিল আহমেদ
৫৬ মন ভালো করা গাছ / মো. সাজিদ হোসেন

গাছ নিয়ে ছোটোদের ছড়া

১৮ সা'দ সাইফ / নিত্তু চৌধুরী / আব্দুস সালাম
ইশরা হোসেন

ছোটোদের কবিতা

৫৭ ফাহিম আসাদ / মো. হাসিবুর রহমান শিহাব
মু. আহনাফ সিদ্দিক

ছোটোদের আঁকা

০৮ কাজী নাফিসা তাবাসসুম
৪০ রাইসা রহমান
৬২ বিন্তি প্রতিকা / আয়ান হক ভূঁঞা
৬৩ নিখিল দাস / ফাতিম তাহানান
৬৪ মো. রাকিবুল ইসলাম / কাজী আরাফাত রহমান
৬৫ নাজিবা সায়েম / মো. সিনদিদ হোসেন

প্রতিবেদন

৫৮ গাছ বন্ধু অসুস্থ হলে করণীয় / জামাল উদ্দিন
৫৯ বালিকারা আর বধূ হবে না / জান্নাতে রোজী
৬০ বাবা দিবস ও শিশুতোষ চলচ্চিত্র / প্রসেনজিৎ কুমার দে

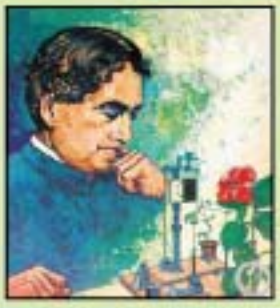

গাছেরও প্রাণ আছে, এ সত্যটি হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। বাংলা ভাষায় প্রথম সায়েন্স ফিকশনও লিখেছিলেন তিনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙালির বিজয় ঘোষণা হয়েছিল প্রথম তাঁর মাধ্যমেই। চেয়েছিলেন বাঙালি গড়ে উঠুক বিজ্ঞানমনস্ক জাতি হিসেবে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণকারী বিশ্ববিখ্যাত সেই বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা জানতে পড় পৃষ্ঠা ২৮ - ৩৩

নবারুণ পরিবেশ সম্মেলন

'প্রকৃতির বন্ধনে প্রাণের স্পন্দনে'

শাহানা আফরোজ

মে মাসের ১৯ তারিখ। বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস জৈষ্ঠ্যের ৫ তারিখ। গ্রীষ্মকাল হলেও বাতাসে গরমটা যেন একটু বেশি। সকাল বেলাই সূর্য্যিমামা রেগে গেছেন। তাই তাপও বেশি। সবাই গরমে অস্থির। এরই মাঝে শোনা গেল কোলাহল। গরমকে উপেক্ষা করে ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুরা সবুজ রঙের জামা পড়ে যাচ্ছে নবারুণের পরিবেশ সম্মেলনে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক নবারুণ আয়োজন করেছে এই পরিবেশ সম্মেলন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন। এ বছরের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'প্রকৃতির বন্ধনে প্রাণের স্পন্দন'। তাইতো চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) সেজেছে ব্যানার ফেস্টুন, নানা রকম ফুল গাছ আর পাখি দিয়ে। সকাল ১০টা না বাজতেই নবারুণ বন্ধুরা তাদের অভিভাবকদের সাথে হাজির হয়ে যায় নবারুণের পরিবেশ সম্মেলনে। খুদে বন্ধুরা যখন নিজেদের মধ্যে পরিচিত হচ্ছিল তখন শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে পেল ফুল, টুপি আর চকোলেট। হাতে ফুল নিয়ে চকোলেট মুখে দিয়ে শিশুরা যখন সবুজ টুপি মাথায় দিল ঠিক তখন সূর্য্যি মামার চড়া রোদ ফিকে হয়ে গেল। এমনিভাবে যদি আমরা চারদিক সবুজে ভরে দিতে পারি তবে সহজেই অতিরিক্ত গরম থেকে রেহাই পাব। পরিবেশ সুন্দর হবে। আমরা বুকভরে নিশ্বাস নিতে পারব।

এটি শেষ না হতেই শোনা গেল অন্য রকম গুঞ্জন। চারদিকের ক্যামেরা জ্বলে উঠল। সবাই তো অবাক, কে এলেন? সবার জিজ্ঞাসার উত্তর নিয়ে এল নবারুণের পরম বন্ধু তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। ছোটো সবুজ বন্ধুদের দেখে তিনি আরো খুশি হয়ে উঠলেন। এর আগে অক্টোবর মাসে নবারুণ আড্ডায়ও তিনি এসেছিলেন। দিয়েছিলেন ছোট্টবন্ধুদের সাথে জমজমাট আড্ডা। সেকথা নিশ্চয়ই তোমাদের সবার মনে আছে। তখন তিনি কথা দিয়েছিলেন নবারুণের এররকম আড্ডায় আবার তিনি আসবেন। তিনি কথা রেখেছেন। এবার এসেছেন নবারুণের পরিবেশ সম্মেলনে।

সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা কামরুন নাহার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনজুরুর রহমান, যুগ্ম সচিব মো. ইব্রাহিম খলিল, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জাকির হোসেন এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শচীন্দ্রনাথ হালদার। এছাড়া নবারুণের খুদে লেখকসহ ছিলেন অনেক শিশু সাহিত্যিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ঢাকা ছাড়াও দূর জেলা শহর থেকে অনেক বন্ধু এসেছিল এ সম্মেলনে।

তথ্যমন্ত্রী আসন গ্রহণের পরপরই নবারুণের খুদে লেখক বন্ধু মীম নোশিন নওয়াল খান তার সাবলীল উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান শুরু করে। তথ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ

জানানোর পর পরিবেশের গুরুত্ব বুঝাতে দুর্যোগ গবেষক মো. সাজিদ উপস্থাপন করলেন পরিবেশ নিয়ে সুন্দর একটি ভিডিও। হাতের আইসক্রিম গলে যাচ্ছে! পৃথিবীটা গরম হলে কী হবে, তা বুঝাতে ঐ গলে যাওয়া আইসক্রিমই যথেষ্ট। এরপর পরিবেশ লেখক মোকাররম হোসেন ঢমৎকার একটি ভিডিও ক্লিপস্ উপস্থাপন করেন। সেখানে তিনি খুদে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেন ছয় ঋতুর ফল, গাছ লাগানোর জন্য স্থান নির্বাচনসহ আরো অনেক কিছু।

মীম মোকাররম হোসেনকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর বিশেষ শিশু বাক প্রতিবন্ধী সংগ্রাম কবীর নিজ হাতে আঁকা তথ্যমন্ত্রীর স্কেচ উপহার দেন। এরপর ছোট্ট বন্ধু সামিহা তাসনিম সিনহা নবারুণের ছাদ বাগানের জন্য একটি আম গাছ উপহার দেয়। এরপর অতিথিরা শিশুদের সঙ্গে গুরু করলেন আড্ডা। প্রথমেই অতিরিক্ত সচিব মনজুরুর রহমান পরিবেশ সম্পর্কে বন্ধুদের বুঝিয়ে দেন। ছাত্রজীবনের কথা উল্লেখ করে বলেন, একটি প্রবন্ধে ডা. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'আমরা বাতাসের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া বাতাসের অস্তিত্ব টের পাই না'। এই যে বাতাস এই মাটি এই সবই পরিবেশ। আমরা ক্রমাগত মাটির বিরুদ্ধে বাতাসের বিরুদ্ধে কাজ করছি। আমরা এগুলোর যখন সহনশীল মাত্রা অতিক্রম করি তখন পরিবেশ বিরূপ আকার ধারন করে এবং তখন প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়।

তিনি আরো বলেন, ছোটোরা যদি সচেতন হয়, তবেই আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী গড়তে পারি। কারণ পৃথিবী একটাই...। এই পৃথিবীকে আরো সুন্দর করার অঙ্গীকার আমাদের করা উচিত। এরকম পরিবেশ সম্মেলনের মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে ভালোবাসা গেঁথে দিতে হবে। তবেই আমরা এই ঢাকা, এই বাংলাদেশ অর্থাৎ পৃথিবীর একটি অংশ পরিবর্তন করতে পারব।

তাঁর বক্তব্যের পর এক সময়ের নবারুণ সম্পাদক, বর্তমানে প্রধান তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত কামরুন নাহার তার জীবনের দেখা সত্য ঘটনা শিশুদের বলেন। তিনি আরো বলেন, সবুজ গাছপালার প্রতীক, পরিবেশের প্রতীক। তোমরা এখন থেকে প্রকৃতিকে ভালোবাসবে। বাবা-মা কে সাথে নিয়ে ছোট্ট হাতে গাছ লাগাবে। দেখবে কত আনন্দ লাগবে। আর এভাবেই বাংলাদেশ সবুজে ভরে যাবে।

এবার ডিএফপি'র মহাপরিচালক তথ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকল অতিথিকে কষ্ট করে সম্মেলনে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন প্রতিটি শিশুর স্বপ্ন থাকে, আমরা চাই সকল শিশুর স্বপ্ন পূরণ হোক। আমাদের সবার স্বপ্ন পূরণ হলেই আমাদের দেশ সুন্দর হবে। শিশুরা সুন্দর মানুষ হিসেবে বড়ো হয়ে উঠবে। শুনে খুশি হবে, ডিএফপি'র ছাদে একটি ছাদ বাগানও গড়ে তোলা হয়েছে। ঐ দিন সম্মেলন শেষে ডিএফপির ছাদে 'নবারুণ ছাদ বাগান' উদবোধন করেন তথ্যমন্ত্রী। ছাদবাগানের গাছগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন নবারুণ সম্পাদক নাসরীন জাহান লিপি। এসময় অনলাইনে নবারুণ পত্রিকা পাঠ উদবোধন করেন তথ্যমন্ত্রী। এখন থেকে ওয়েব সাইটে পত্রিকাটি পড়া যাবে।

গরমে সব বন্ধুরা যখন পরিশ্রান্ত তখন তাদের চাঙা করতে মীম শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছোট্ট বন্ধুদের তাৎক্ষণিক গান, ছড়া কবিতা পরিবেশ সম্মলনেকে করে তোলে আরো প্রাণবন্ত।

সবকিছুর শেষ আছে। তাই নবারুণ পরিবেশ সম্মেলনও শেষ হয়। তাদের আপন আলয়ে ফিরে যায় খুদে বন্ধুরা। কিন্তু নবারুণ বন্ধুদের কোলাহলের রেশ ডিএফপির আঙিনায় গুনগুন করে এখনও।

নবারুণ পরিবেশ সম্মেলন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এ সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী উপস্থিত হয়ে শিশুদের জন্য সাবলীল সহজ সরল ভাষায় কিছু বলে গেলেন, দিয়ে গেলেন উপদেশ। প্রথমেই তথ্যমন্ত্রী নবারুণ পরিবেশ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল বালক-বালিকা, অভিভাবকবৃন্দ সহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জনান এরপর নবারুণ খুদে বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলে কথা বললেন। তথ্যমন্ত্রীর সেই কথাগুলো তোমাদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো।

পড়তে পারেন। আচ্ছা, খুব ভালো। আজকে আমরা নবারুণ পরিবেশ সম্মেলনে মিলিত হয়েছি। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে পৃথিবী, বাংলাদেশেও করে। এখানে বালক আছে, বালিকা আছে, বলা হচ্ছে যে শুধু গানবাজনা, লেখাপড়া করলে চলবে না। আপনাকে পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হবে। পরিবেশ মানে হচ্ছে আকাশ, বাতাস, মাটি, নদী-নালা, সাগর, বাঘ, ভালুক, কুকুর, পোকামাকড় এগুলো হচ্ছে পরিবেশ।

মনে থাকবে? হ্যাঁ পোকামাকড়, কুকুর বিড়াল বাঘ, ভালুক নদীনালা, গাছপালা, সাগড়, পাহাড়, বিল এগুলো হচ্ছে পরিবেশ। সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তবে আমাদের বাতাসটা ঠিকঠাক থাকবে। আমরা যে বাতাসে নিশ্বাস নেই, বাতাসটা যদি খারাপ হয়ে যায় তবে আমাদের নিশ্বাসে কষ্ট হবে। হাঁসফাস করব। আগে আগে মরে যাব আমরা। সেজন্য বাতাসটা ঠিকঠাক রাখতে হবে। বাতাস যদি বেশি গরম হয়ে যায় তবে আমরা হু হা করব। বাতাসে যদি বিষাক্ত সব জিনিস ঢুকে যায় তবে বুকের ভিতরে জ্বালাপোড়া হবে, পেটে গণ্ডগোল হবে, রোগবালাই হবে, গলা ফুলে যাবে, চোখ জ্বালা করবে কত রকম ঝামেলা তাই না। তাই বাতাস ঠিক রাখতে হবে তেমনি পানিটাও ভালো রাখতে হবে। পানিটা যদি খারাপ থাকে তবে পেটে অসুখ হবে। ডাক্তার পেট কাটবে বহু ঝামেলা তাই না। তাই পানি ঠিক রাখতে হবে, বাতাসটা ঠিক রাখতে হবে, পরিবেশ ঠিক রাখতে হবে। ঘরবাড়ি যদি পরিস্কার না থাকে ময়লা থাকে তবে গন্ধ বের হবে। তখন আমাদের কষ্ট হবে না? তাই পরিবেশ যদি ঠিক না থাকে গাছপালা না থাকে, পশুপাখি পোকামাকড় ঠিক না থাকে তবে আমাদের অসুবিধা হয়। পানি খারাপ হয়, বিপদ হয়। এজন্য বাতাসে পানি ঠিকঠাক রাখতে হবে। তাই আমরা যখন লেখাপড়া করব তখন আমাদের লেখাপড়ার ভেতরে পরিবেশ জ্ঞান পাঠ্যসূচিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। আর আমরাতো উন্নয়ন করি, উন্নতি করি। রাস্তাঘাট বানাই ঘড়বাড়ি বানাই, কারখানা বানাই। তা না হলে তো চাকরি বাকরি হবে না। আমাদের পেট চলবে না। আমরা তো এগুলো বানাতেই থাকব কিন্তু আমাদের এই উন্নয়নটা পরিবেশকে রক্ষা করে অর্থাৎ পরিবেশকে বাঁচিয়ে উন্নয়ন করতে হবে। সেটাই টেকসই উন্নয়ন। সুতরাং আমরা প্রতীক্ষা করব পরিবেশও বাঁচাব, উন্নয়নও করব। অপচয় করব না, উন্নয়ন করব। আমরা যখন স্কুলে যাব আমাদের পাঠ্যসূচিতে অবশ্যই পরিবেশ সম্পর্কে কথা থাকবে। সুতরাং লেখাপড়া শিখব। পরিবেশ সম্পর্কেও জানব। এখন কথা শেষ হয়ে গেল আমরা এটি দিয়ে ছড়া করে বলি। এসো এক সাথে বলি, লেখাপড়া শিখব, পরিবেশ সম্পর্কে জানব। আস্তে বললে হবে না, আবার বলেন, লেখাপড়া শিখব, পরিবেশ সম্পর্কে জানব। আমরা সবাই মানুষ হব। মানুষের মতো মানুষ হব। আবার বলি, লেখাপড়া শিখব, গাছপালা ভালোবাসবো। পশুপাখি মায়া করব (জোড়ে)।

এখন আবার বলি পশুপাখি মায়া করব। ঘরবাড়ি আশপাশ ঠিকঠাক রাখব। একটি করে গা--ছ লাগাব। অপচয় থেকে দূ--রে থাকব। মনে থাকবে তো। কথাগুলো তোমাদের বাবা-মাকে লিখে দিয়ে যাচ্ছি আগামীবার আসলে মুখস্ত ধরব। যেভাবে আমরা বলি না- সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সেভাবে মুখস্ত বলতে হবে। এখন আবার বলেন লেখাপড়া শিখব, গাছপালা ভালোবাসবো পশুপাখি মায়া করব। ঘরবাড়ি আশপাশ ঠিকঠাক রাখব। একটা করে গাছ লাগাব। অপচয় থেকে দূরে থাকব। এবার আমার গল্প শেষ নটে গাছটি মুড়ালো। পরিবেশ বাঁচিয়ে উন্নয়ন করতে হবে। পরিবেশ বাঁচিয়ে যে উন্নয়ন সেটি টেকসই উন্নয়ন। প্রত্যেক পাঠ্যসূচিতে পরিবেশ জ্ঞান থাকতে হবে। পরিবেশ রক্ষা করে উন্নয়ন করতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই একসাথে বলেন- জয় বাংলা।

বিপন্ন প্রকৃতি
সংকটে পরিবেশ

মোকারম হোসেন

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে প্রকৃতি একটি নিজস্ব নিয়মে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি কিছু উপাদান বর্জন করে আর কিছু গ্রহণ করে। কিংবা এভাবেও বলা যায় যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনে একটি পথ তৈরি করে নেয়। এই পথ অনেকটা বিরান কোনো মাঠের ওপর তৈরি করা নতুন সড়কের মতো। নতুন নতুন সড়ক নির্মাণের ফলে যেখানে স্থানীয় লতাগুল্ম বা ঝোপঝাড়গুলো চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে অব্যাহত অবকাঠামো নির্মাণ, নানামাত্রিক দূষণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং সর্বোপরি নির্বিচারে বন উজাড় প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্টে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখছে। অবশ্য বড়ো মাত্রায় পরিবেশ দূষণে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভূমিকা খুব একটা নেই। উন্নত দেশগুলোই এমন আত্মঘাতি কাজে সরাসরি জড়িত। আমাদের দেশের কলকারখানার দূষিত বর্জ্য ও ধোঁয়া পরিবেশের যে পরিমাণ ক্ষতি করে তার চেয়ে কয়েকশ গুণ ক্ষতি করে উন্নত দেশগুলো। অথচ এর নেতিবাচক প্রভাব আমাদেরকেই বেশি পরিমাণে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে তারাই আবার পরিবেশ সুরক্ষার কাজে বেশি সোচ্চার। আর এসব তোড়জোড়ের অধিকাংশই লোক দেখানো। বিভিন্ন সভাসমিতি, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করে উন্নত দেশগুলো গরিব দেশগুলোকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে। তাদের সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। কিন্তু সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা শেষ পর্যন্ত একমত হতে পারেন না। বিভিন্ন দেশগুলোকে ক্ষতিকর গ্যাস প্রবাহের যে মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয় শেষ পর্যন্ত কেউ আর তা মেনে চলে না। এমনকি কিছু কিছু সম্মেলন শেষ হয় কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই। তাই বলে সভাসমিতির কাজ থেমে নেই এবং এ ব্যাপারে উৎসাহেরও কমতি নেই।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিষাক্ত বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে তা আমাদের দেশকে প্রতিনিয়তই দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালো থাবায় প্রকৃতির অনবদ্য ধারাবাহিকতাও বিঘ্নিত

হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এমন একসময় আসবে যখন ঋতু বৈচিত্র্য বলে আর কিছু থাকবে না। প্রকৃতি তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলবে। তার কিছু ইঙ্গিতও আমরা ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছি। শীতকালে শীতের তীব্রতা কম থাকা, বর্ষায় বৃষ্টির স্বল্পতা, কিংবা অমৌসুমে বৃষ্টিপাত, আবার প্রলম্বিত গ্রীষ্মকাল। অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে শরৎ ও হেমন্তকালের পরিধি। আমাদের অনুভবে শরৎ বা হেমন্ত এখন আর আগের মতো প্রাণময় হয়ে ধরা দেয় না। এতদিন প্রকৃতি যে নির্দিষ্ট ছকে হেঁটেছে তার থেকে অনেকটাই সরে এসেছে এখন। বিশেষত বৃক্ষ জগতেও নানামাত্রিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে সারা বিশ্ব এক ঘোরতর দুর্দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা কতটা তীব্র ও ভয়ংকর হতে পারে তার কিছুই আমরা এখনো উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি। বিজ্ঞানীরা অবশ্য আরো একশ বছর আগেই শিল্পোন্নত দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতার বাজারে বিজ্ঞানীদের এসব সতর্ক বার্তা কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি।

যেখানে কোনো গাছ নেই সেখানে কোনো প্রাণ নেই। গাছপালা আছে, সবকিছু আছে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের জীবনে গাছপালার ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা দু' এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন তা গাছপালাই শোধন করে প্রকৃতিতে ছড়িয়ে দেয়। প্রতিবছর আমাদের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে যে-সব ঝড়-জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে তা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পারে গাছপালার নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র বুনন। গাছের আচ্ছাদন ঝড় ও জলের গতি কমিয়ে দিতে পারে। তেমনি তাপমাত্রাও কমিয়ে দিতে পারে। মাটির ক্ষয়রোধ করে ভূ-ভাগের উচ্চতা সমুন্নত রাখতে পারে। প্রাণীদের খাবারদাবারের যোগানও গাছপালা থেকেই আসে। তা ছাড়া বনভূমিই হচ্ছে জীবজন্তুর সবচেয়ে প্রিয় আবাস। আমাদের প্রতিদিনের খাবারদাবারের বেশিরভাগই আসে তরুজগতের মাধ্যমে। সর্বোপরি সমগ্র পরিবেশ ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করছে বনভূমি। এসব তো কেবল বনভূমির অতি দরকারি কতগুলো দিক। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে মানুষ যখন খাঁ-খাঁ রোদ্দুরে পথে বের হয় তখন গাছের ছায়া খোঁজে। গাছের ছায়ায় দু-দণ্ড বিশ্রাম নেয়। ভালোবেসে সুন্দর ফুল ও ফলের গাছগুলো ঘরের পাশে লাগিয়ে রাখে। গাছের ফুল, ফল, পাতা থেকে ওষুধ বানায়।

আমাদের মতো একটি দেশে রাতারাতি পরিবেশ বদলে ফেলা প্রায় অসম্ভব। আমাদের হাতে এমন কোনো ম্যাজিক নেই যে রাতারাতি সবকিছু বদলে দেওয়া যাবে। কাজেই এগিয়ে যেতে হবে পরিকল্পিত উপায়ে।

শুধুমাত্র সমন্বিত উদ্যোগই পরিবেশের এই জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের সহজ পথ হতে পারে। সচেতনতা এ ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক। মানুষ সুশিক্ষিত হলেই কেবল সচেতন হতে পারে। সঙ্গে যদি সচ্ছলতা যোগ হয় তার ফলাফল নিঃসন্দেহে ভালো। যে কারণে আমরা উন্নত দেশগুলোতে সাধারণ মানুষের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের কোনো দৃশ্য সচরাচর দেখি না। সবাই সচেতন, এক টুকরো কাগজও কেউ নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে ফেলবে না। ইচ্ছা করলেই একটা গাছ কাটা যায় না, বন উজাড় করা যায় না, খাল-নদী এসব দখল করা যায় না, যেখানে সেখানে বাড়ি কিংবা কারখানা বানানো যায় না। আমরা যদি সচেতন হই তবে আমরা আমাদের দেশকে উন্নত দেশের মতো গড়তে পারি।

ফরাসি লেখক জাঁ গিওনোর 'দি ম্যান হু প্লান্টেড ট্রিস' গল্পটির কথা মনে পড়ে? এই অমর গল্পের মূল নায়ক একজন মেষ পালক, নাম অ্যালজার্ড বুফিয়ের। যিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে ফ্রান্সের এক বিজন ও রুক্ষ উপত্যকায় গাছ লাগিয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন শত শত ওক ও বার্চের বীজ বুনতেন পাহাড়ের ঢালু উপত্যকায়। এভাবেই ধীরে ধীরে একদিন সেই মরুময় উপত্যকা সহস্র বৃক্ষে সুশোভিত হয়ে ওঠে। বুফিয়ের একা একাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এমন অসাধ্য সাধন করেছিলেন। যে-কোনো পরিবর্তনের জন্য মাত্র একজন নিষ্ঠাবান মানুষের উদ্যোগই বেশ বড়োসড়ো ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের দেশে হয়ত বুফিয়ের- মতো কাউকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন যারা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও নিভৃতে বৃক্ষায়নের কাজটি করে চলেছেন। তারা যেমন সবুজ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন আবার দেখাচ্ছেনও। এরাই আমাদের বুফিয়ের। পত্রিকার মাধ্যমে আমরা এমন খবরগুলো প্রায়ই জানতে পারি।

ইচ্ছে করলেই আমরা এই দেশটাকে আবারো সবুজে মুড়িয়ে দিতে পারি। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমাদের এই ভূ-ভাগ তুলনামূলকভাবে অনেক

নবীন। এটা আমাদের জন্য একটা বড়ো সুযোগ। এই সুযোগটাই যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। তবে এটা ঠিক যে মানুষ কখনো বন তৈরি করতে পারে না। বন তৈরি হয় নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়মে। শত শত বছরের প্রাকৃতিক ধারাবাহিকতায় কেবল বনভূমি গড়ে উঠতে পারে। অন্য কোনোভাবে নয়। এ কারণেই মানুষ শুধু বৃক্ষায়নের কাজটিই করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে বনায়ন শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ভিত্তিহীন ও ভুয়া। আমাদের মাটি এতই উর্বর যে কোথাও দুটি গাছ রোপণ করলে কয়েক বছর পর দেখা যায়, সেখানে আরো দশটি গাছ আপনা আপনিই জন্মেছে। এটা আমাদের মাটির গুণ। গাছপালা লাগানোর ক্ষেত্রে সমগ্র উপকূলকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলো সংরক্ষিত থাকলে আমরা অনেকটাই নিরাপদে থাকব।

একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, খুবই স্বল্প পরিসরের কোনো একটি পতিত স্থান হরেকরকম তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত। এত স্বল্প পরিসরে গাছপালার এত বিচিত্রতা সত্যিই দুর্লভ। দেশজুড়ে একই চিত্র চোখে পড়বে। মৃত্তিকার আপন গুণই এখানে গাছপালার অফুরান প্রাণশক্তি। পুরনো দালানকোঠার ফাঁকফোকরে জন্ম নেয় অনেক পরজীবী; বট, অশ্বত্থ, ফার্ণ। তাছাড়া উষ্ণমণ্ডলের বীজগুলো অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু। এরা বংশবিস্তারের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারে। আমাদের দক্ষিণের নোনা জলের বন এবং বিল-হাওরের উদ্ভিদরাজিরও প্রজনন প্রক্রিয়া একই। বর্ষার উপচে পড়া পানিতে আশপাশের তৃণগুল্ম আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু পানি শুকিয়ে যেতে যেতে আবারো নবজন্মে উদ্বেলিত হয় নতুন প্রাণ। সবচেয়ে বড়ো কথা এখানে সবুজায়নের জন্য খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয় না। অথচ একবার শীতপ্রধান দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ। তাদের গ্রীষ্ম মাত্র তিন-চারমাস। যদি কপাল খারাপ হয়, তাহলে মাঝে মাঝে গ্রীষ্ম উপভোগ করারও কোনো সুযোগ হয় না। সেখানে যখন গ্রীষ্ম একটু একটু করে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে তখন থেকেই শুরু হয় বাগান সজ্জার কাজ। গোটা শীতকাল বাগানটা যখন বরফের নিচে চাপা থাকে তখন সেখানে আর কোনো প্রাণের স্পন্দন থাকে না। ফলে গ্রীষ্মে ওদেরকে অনেকটা শূন্য থেকেই শুরু করতে হয়। ওরা দশটা গাছের পরিচর্যার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে আমাদের একটি বাগানের জন্যও তা ব্যয় হয় না বা করা যায় না। প্রকৃতির এই অফুরাণ প্রাণসম্পদকে আমরা খুব সহজেই কাজে লাগাতে পারি। বদলে দিতে পারি নিজেদের ভবিষ্যৎ।

কাজী নাফিসা তাবাসসুম, দশম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আমাদের গড়া পরিবেশ আইন

মোসাঃ তানিয়া আক্তার

বন্ধুরা, তুমি, আমি ও আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে এসব নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান রয়েছে। এগুলো জানা আমাদের জন্য জরুরি।

শব্দদূষণ

সরকার বিভিন্ন স্থানের জন্য শব্দের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা বেঁধে দিয়েছে। আবাসিক এলাকা, অনাবাসিক এলাকা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি এলাকার শ্রাব্যতার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছে সরকার। এই সীমা অতিক্রম করলে সাধারণত আমরা ধরে নেই সেখানে শব্দদূষণ হচ্ছে। আবাসিক এলাকায় ভোর ছয়টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শব্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ৫৫ ডেসিমেল এবং রাত নয়টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মাত্রা ৪৫ ডেসিমেল। আবাসিক এলাকার আধা কিলোমিটারের মধ্যে শব্দদূষণ উৎপাদনকারী ইট ভাঙার যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে হর্ন বাজানো যাবে না। শব্দদূষণ কীভাবে রোধ করা যায় সেটি শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬-এ উল্লেখ করা আছে। সরকার নির্ধারিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিত,

মৌখিক বা টেলিফোনের মাধ্যমে অবহিত করলে উক্ত কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিবেন। এমনকি শব্দ দূষণকারী যন্ত্রপাতি আটক করতে পারবেন। এই আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো অপরাধ করলে সর্বোচ্চ ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

বায়ুদূষণ

আমাদের আশপাশে যে ফাঁকা স্থানগুলো রয়েছে যাকে আমরা বায়ু বলে ডাকি-সেটি মূলত বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ। যেখানে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, হাইড্রোক্সাইড, সালফার ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুতে কোনো একটি গ্যাসীয় পদার্থ বেশি পরিমাণে ছেড়ে দিলে সেটি ঐ স্থানের বায়ুর ভারসাম্য নষ্ট করে। মানুষ ও জীবজন্তু নিশ্বাসের মাধ্যমে সেটি নিলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কাও তৈরি হয়। কলকারখানার সৃষ্ট ধোঁয়া এবং যানবাহন সৃষ্ট ধোঁয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার এই গ্যাসীয় পদার্থগুলো বাতাসে কী পরিমাণ তা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-এর তফসিলগুলোতে উল্লেখ করেছেন। বায়ুতে গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট মাত্রা কোনো যানবাহন বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি লঙ্ঘন করে তবে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ১৫ ধারা অনুযায়ী প্রথমবারের মতো অপরাধ করলে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করা যাবে। পুনরায় অপরাধ করলে সর্বনিম্ন দুই বছর এবং সর্বোচ্চ দশ বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

পানিদূষণ

'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' ১৯৯৫-এর ৬(৬) ধারা অনুযায়ী, যে-সব স্থান জলাধার হিসেবে চিহ্নিত সেগুলো সরকারের অনুমতি ব্যতীত ভরাট করা যাবে না। মাটির নিচের কোন স্তর পর্যন্ত পানি উঠানো যাবে এটি স্থান ভেদে সরকার ঠিক করে দিবে। একে পানির নিরাপদ আহরণ সীমা বলে। কোনো জলাধার থেকে

পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বা স্রোতকে কোনো ব্যক্তি বাধা দিতে পারবে না কিংবা তার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারবে না। অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি জলস্রোতের পানি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ধারাকে মজুদ করতে পারবে না। শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি পানিতে ফেলা যাবে না। এসব বিষয়ের ব্যত্যয় ঘটালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ১৫ ধারা অনুযায়ী সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং পরিবেশ আদালতে উক্ত অপরাধের প্রতিকার চাওয়া যাবে।

গাছ কাটার বিধি নিষেধ

আমরা যে পথ দিয়ে স্কুলে যাই সে পথের দু'পাশে লাগানো সারি সারি গাছ, স্কুলের সীমানার মধ্যে

লাগানো গাছ, সরকারি জমিতে লাগানো গাছ এসব স্থানের গাছ সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কাটা যাবে না। সরকার সাধারণত মানুষের উপকারের জন্যই বিভিন্ন স্থানে গাছ লাগিয়ে থাকে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে লাগানো গাছ কাটা যাবে। তবে সরকার একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে যেখানে বলা আছে মানুষ ইচ্ছে করলেই গাছ কাটতে পারবে না। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি নিতে হবে। বর্তমানে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন বনভূমি যেমন সুন্দরবন, মধুপুরের ভাওয়ালের গড় এবং কৃত্রিমভাবে তৈরি করা কিছু বনভূমি যেমন লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ ইত্যাদির গাছ কাটা সম্পূর্ণ নিষেধ। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ক্ষমতাবলে সরকার যে-কোনো স্থানকে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করতে পারে এবং গাছ কাটার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে।

বন্ধুরা, পরিবেশ বিষয়ক আরো অনেক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে। আরো বড়ো হলে তোমরা সেগুলোও জানতে পারবে। পরিবেশ আইন বিষয়ে সচেতন হয়ে পরিবেশ রক্ষায় তোমরাও এগিয়ে আসবে।

নাম লিখেছি পাতায় পাতায়

ফারুক নওয়াজ

ঝিলমিলানো ইমলিপাতা, ইপিলইপিল, আম
সব পাতাতে আমি আমার নাম লিখে রাখলাম।
ঝাবুকপাতায় চিবুক রেখে তাকিয়ে দেখ ঠিক-
দেখবে আমার নামটি কেমন করছে ঝিকিমিক!
ঘাসের ঝোপে কাশের বনে কুসুমবাগিচায়...
ভোরবেলাতে যখন মৃদু বাতাস খেলে যায়...
তখন যত বনের পাখি জুড়বে কলরব—
পাতায় পাতায় দেখবে আমার নাম-ঠিকানা সব।
মউলপাতায়, মৌরিপাতায়, পিপুলপাতাতে...
কাচপোকারা আসে যখন দুপুর মাতাতে...
টুপুস টুপুস ঝরলে পাতা উদাস হাওয়াতে—
বন্ধু তুমি দেখবে আমার নাম লেখা তাতে।
বেতসলতার সঙ্গে আমার সখ্য সুনিবিড়...
চিনি আমি বইচি-ঝোপে টুনটুনিদের নীড়
চিনি আমি আপাংপাতা, আকাশবেলের মন...
জানি আমি কখন ফোটে পারুল ও রঙ্গন।
কখন আমি কোথায় থাকি, নাই আমি থাকলাম—
সব পাতাতে খুঁজে পাবে তোমরা আমার নাম।

সাবধান!!

ডিজিটাল বর্জ্য

মেজবাউল হক

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবেশ করে কম্পিউটার। একই সময় আর্বিভাব ঘটে মোবাইল ফোনের । দুটিরই প্রাযুক্তিগত বিকাশে দামে যেমন সস্তা, তেমনি ব্যবহারেও হয় সহজ। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় ইন্টারনেট। সব মিলিয়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফোন মানুষের জীবনযাত্রায় মিলেমিশে একাকার।

প্রথমদিকে একজনের বাড়িতে একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার অথবা মোবাইল ফোন থাকলে অনেকের কাছে এটা উৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অনেক যত্ন নিয়ে ব্যবহার করত সবাই। প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে এটি এখন প্রায় সবার হাতে হাতে। এই প্রযুক্তি গান শোনা, ছবি দেখা, মুভি দেখা থেকে টিভি দেখা, রেডিও, রক্তচাপ মাপার ব্যবস্থাসহ দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির এই বিকাশের ধারায় আমরা এখন স্মার্টফোনের যুগে আছি, যেখানে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার প্রযুক্তি ও জিপিএস, ইন্টারনেটের এক অভিনব সমন্বয় ঘটেছে। দামও মানুষের নাগালের মধ্যে। কিন্তু সহজলভ্য হওয়ায় এই প্রযুক্তির প্রতি আমরা যত্ন হারিয়েছি; সহজেই ফেলে দিতে পারছি। পরিণামে এই পরিত্যক্ত মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর এক পাহাড় আমরা চারপাশে জমিয়ে ফেলছি। এটাই ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্য। ই-বর্জ্য বলতে শুধু যে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনকে বোঝায়, তা নয়। বন্ধুরা, তোমাদের বাসায়ও টেলিভিশন, এলইডি লাইট, প্রিন্টার, মোবাইল চার্জারসহ নানা পণ্য রয়েছে। বিশ্বব্যাপী এই ই-বর্জ্য মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। চিকিৎসকদের মতে, এর অপরিকল্পিত ব্যবহার শুধু স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করে না, অনেক ক্ষেত্রে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। যেহেতু ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির আরেক ধাপ অগ্রগতি হলো ডিজিটাল প্রযুক্তি। তাই বর্তমানে এগুলোকে ডিজিটাল বর্জ্য বলেই অভিহিত করা হয়।

অনেকদিন ধরে ডিজিটাল প্রযুক্তির অপরিকল্পিত ও অপরিমিত ব্যবহার আমাদের দেশকে মারাত্মক বর্জ্যের হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এসব পণ্য থেকে নির্গত হচ্ছে মার্কারি, লেড, জিংক, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, নাইট্রাস অক্সাইড, এসিডসহ ৩৬ ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান। যার প্রভাবে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সারসহ মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ই-বর্জ্য ক্যান্সার, কিডনির সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা, নবজাতকের বিকলাঙ্গতাসহ বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী।

দেশের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর জমা হচ্ছে এক কোটি টন ই-বর্জ্য। দুই বছর অন্তর এই বর্জ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়ছে। খোদ পরিবেশ অধিদপ্তরের সমীক্ষা বলছে, ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় ৫০০ টন ই-বর্জ্য বাড়ছে। আর দেশে মোট ই-বর্জ্যের ১৫ শতাংশই শুধু তৈরি হচ্ছে ঢাকায়।

এই সংকট থেকে বের হয়ে আসতে যত দ্রুত সম্ভব ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। করা যেতে পারে একটি নীতিমালা। যেটি অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালিত হবে। গড়ে প্রতিদিন দেশে ৭৭ শতাংশ মানুষ ই-বর্জ্য শহরের ডাস্টবিনে ফেলছে। যদি আমরা যত্রতত্র ভাবে এগুলো ফেলা থেকে বিরত থাকি, তাহলেও ই-বর্জ্য অনেক নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে সবাইকে মনে রাখতে হবে, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও পরিমিত ব্যবহার আমাদের এই মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

পদ্মা নদীর গল্প

মীম নোশিন নাওয়াল খান

হিমালয় পর্বতমালা। অনেক গুলো পর্বত মিলে একসঙ্গে থাকে। তাদের সারা শরীর বরফে ঢাকা। প্রচণ্ড ঠান্ডা।

হিমালয় খুব একা। প্রচণ্ড ঠান্ডা হওয়ায় তার কাছে কেউ আসে না। বিশাল বড়ো জায়গা জুড়ে তার বিস্তৃতি, পুরোটাই নিশ্চুপ, নিঝুম।

হিমালয়ের ইচ্ছে তার অনেক বন্ধু থাকুক। কথা বলার কেউ থাকুক। তাই সে প্রার্থনা করল, তার গা থেকে যেন বরফ গলে অনেক গুলো নদী তৈরি হয়। তাহলে সে কথা বলার বন্ধু পাবে। তার গা থেকে কুলকুল করে ঝর্ণা বইবে, নদী বইবে। ইশ! কী সুন্দরই না দেখাবে তাকে!

সৃষ্টিকর্তা হিমালয়ের প্রার্থনা শুনলেন। তার গা থেকে বরফ গলে তৈরি হলো অনেক নদী। সেই নদীগুলোর মধ্যে দুটো হচ্ছে অলকানন্দা আর ভাগীরথী। হিমালয়ের বুকে ৩,৯০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এক হিমবাহ থেকে বরফ গলে পানি হয়ে তাদের জন্ম হলো।

অলকানন্দা আর ভাগীরথী ভাবল, একা একা থাকা খুব কষ্ট। দুজনে বন্ধু হলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। তারা দুজন একসঙ্গে হয়ে গেল। দুজন একসঙ্গে হয়ে এক বিরাট নদী তৈরি করে ফেলল। ভারতবর্ষের লোক তার নাম দিল- গঙ্গা।

গঙ্গা নদী হিমালয় থেকে বেরিয়ে ভাবল, পৃথিবীটা দেখবে সে। পুরো পৃথিবীটা কীভাবে দেখা যায়? তাই সে একটা বুদ্ধি করল। নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করল। তার একটা অংশ ছুটতে ছুটতে ভারত পার হয়ে ঢুকে পড়ল বাংলাদেশে। এ দেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা দিয়ে ঢুকে পড়ার পর এ দেশের মানুষ তার নাম রেখে দিল 'পদ্মা।'

ব্যস! গঙ্গা নদী হয়ে গেল পদ্মা নদী। নতুন নাম পেয়ে দারুণ খুশি হলো পদ্মা। কিন্তু খুশি হয়ে থমকে গেলে তো চলবে না। তাকে তো পৃথিবীটা দেখতে হবে।

মনের আনন্দে কুলকুল করে বইতে লাগল পদ্মা নদী। তৈরি করল দুটো উপনদী- মহানন্দা আর পুনর্ভবা। মহানন্দা বাংলাদেশেই রয়ে গেল। তবে পুনর্ভবা বইল বাংলাদেশ আর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ- দুটোর উপর দিয়েই।

চলতে চলতে গোয়ালন্দে এসে পদ্মার সঙ্গে দেখা হলো যমুনার। যমুনার সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলল পদ্মা। যমুনাকে নিয়ে নিলো তার সঙ্গে, পৃথিবী দেখতে।

আবার চলতে লাগল সে। এবার চলতে চলতে চাঁদপুর জেলায় গিয়ে সে পেল মেঘনা নদীর দেখা। খুব ব্যস্ত হয়ে মেঘনা বয়ে যাচ্ছে। পদ্মা জিজ্ঞেস করল, তুমি কে বোন? কোথায় যাচ্ছ?

মেঘনা গম্ভীর গলায় বলল, আমি মেঘনা। আমি সমুদ্র দেখতে যাচ্ছি।

পদ্মা চোখ বড়ো বড়ো করে জিজ্ঞেস করল, সমুদ্র! সেটা আবার কী? কী আছে সেখানে?

মেঘনা হেসে ফেলল। বলল, সমুদ্র হচ্ছে সেই জায়গা-

যেখানে সব নদীদের দেখা হয়। সবাই একসঙ্গে গিয়ে সেখানে মেশে। তারপর সবার পানি একসঙ্গে হয়ে একসঙ্গে চলে। সেই হচ্ছে সমুদ্র। সে বিরাট বড়ো। অনেক জল তার গায়ে। অনেক নদী তার গায়ে।

পদ্মা অবাক হয়ে বলল, তাই! কখনো শুনিনি তো! মেঘনা, তুমি আমাকে তোমার সাথে সমুদ্রে নিয়ে যাবে?

মেঘনা হাসল। বলল, বেশ তো। চলো।

ব্যস। পদ্মা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে মেঘনার সাথে চলতে শুরু করল। তারা দুজন যখন একসঙ্গে হলো, তখন পদ্মার নামটা লোকে ভুলেই গেল। লোকে তাকে মেঘনা নামেই চিনল।

পদ্মার অবশ্য তাতে একটুও দুঃখ নেই। সে সমুদ্রে যাচ্ছে- এটাই তার কাছে সবচেয়ে আনন্দের কথা। পদ্মা-মেঘনার সাথে চলতে লাগল। চলার পথে সে অনেক শাখাপ্রশাখা তৈরি করল। সেগুলোকে মানুষ খুব সুন্দর সুন্দর নাম দিল। গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব- এরকম মজার মজার নাম দিল মানুষ তার শাখাগুলোকে। প্রশাখাগুলোরও নাম রাখল- মধুমতি, পশুর, কপোতাক্ষ- আরো কত কিছু!

এই নদীগুলো যে কত জায়গায় ঘুরল, কত কিছু দেখল! তারা কুমিল্লা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর- কত কত জেলায় যে ঘুরে বেড়ালো! শুধু কী তাই! মানুষ যে তাদের কত প্রশংসা করল!

পদ্মার পাড়ে মানুষ বসতি গড়ল, তার গায়ে মাঝি নৌকো ভাসালো। তার থৈ থৈ পানিতে নীল আকাশের নিচে ভাটিয়ালি গান গেয়ে বৈঠা বায় মাঝি, তার নৌকার রঙিন পাল আকাশে ওড়ে। পদ্মার পানিতে অনেক মাছ ঘর বানালো। রুপোর মতো চকচকে ইলিশ ঘুরে বেড়ায় তার বুকে। পদ্মার যে কী আনন্দ! তার মাথার উপরে আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল। জেলেরা তার বুকে জাল ফেলে মাছ ধরে। পদ্মা হয়ে গেল খুব চঞ্চল, ব্যস্ত একটা নদী।

সেই সাথে সে হয়ে উঠল অপূর্ব সুন্দরি। তাকে দেখে বাংলার কবি-সাহিত্যিকেরা বললেন, এমন সুন্দর নদী তাঁরা দেখেননি আর। প্রায় সবাই পদ্মাকে নিয়ে গান লিখলেন, কবিতা লিখলেন, গল্প-উপন্যাস লিখলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মার পাড়ের মানুষদেরকে নিয়ে যে উপন্যাসটা লিখলেন, তার নাম দিলেন 'পদ্মা নদীর মাঝি।' সেই উপন্যাস সবাই খুব পছন্দ করল।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে নিয়ে গান লিখলেন-

পদ্মার ঢেউ রে-

ও মোর শূন্য হৃদয়, পদ্ম নিয়ে যা যা রে...

পদ্মার খুব আনন্দ। কত বড়ো বড়ো মানুষেরা তাকে নিয়ে লেখে, তার ছবি আঁকে। সে চঞ্চল মেয়ে হয়ে ফুরফুরে মনে কুলকুল করে বয়ে চলল।

চলতে চলতে পদ্মা আর মেঘনা সত্যিই একদিন সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেল। নদীটা আনন্দে চিৎকার দিয়ে বলল, এত্ত সুন্দর সমুদ্র! এত্ত সুন্দর!

হাসিখুশি সমুদ্র তাকে দেখে হেসে বলল, এসো। আমার কাছে এসো। আমার বুকে অনেক আনন্দ, অনেক খুশি।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে পদ্মা-মেঘনা ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে। সেই সমুদ্রের নাম বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগর পরম মমতায় নদীটাকে বুকে টেনে নিল।

যখন পদ্মা-মেঘনার সাথে বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছুল, তখন সে ইতোমধ্যে অনেক লম্বা হয়ে গেছে। সে হয়ে গেছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। তার দৈর্ঘ্য তখন ৩৬৬ কিলোমিটার।

অন্য নদীরা বলল, পদ্মা! তুই তো এই দেশের মানুষের জীবনের অংশ হয়ে গেছিস! তোকে ছাড়া এ দেশের মানুষেরা কিছু ভাবতেই পারে না!

পদ্মা লজ্জা পেয়ে হাসল। তারপর সে মিশে গেল সমুদ্রের বুকে। সমুদ্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়েই সে পৃথিবী দেখবে, সমুদ্রের পরম মমতায় নিজেকে আগলে রেখে।

একাদশ শ্রেণি, বিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নবারুণ-এর দেওয়া গাছটি

মারজুক আব্দুল্লাহ

২৯ অক্টোবর ২০১৬ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে আমাদের নবারুণ আড্ডা হয়েছিল। সরকারের তথ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। নবারুণ আনটি (লিপি আনটি) আমাদের মাঝে ছিলেন। নবারুণের দূর দূরান্তের খুদে লেখকরা একসাথে সমবেত হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে। বাচ্চা লেখকদের কিচিরমিচিরে মন্ত্রী মহোদয় আনন্দ পাচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সকলকে দেশপ্রেমে উদবুদ্ধ হতে উপদেশ দেন। নবারুণ সেপ্টেম্বর সংখ্যার কিছু লেখা নিয়ে দু একজনকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়। তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমার বলার অভ্যাস না থাকাতে খুব নারভাস হয়েছিলাম। সঙ্কুচিত ভাবে অল্প কিছু বললাম। কি বলেছিলাম নিজেই টের পাইনি। অনুষ্ঠান শেষে সকলের মধ্যে সার্টিফিকেট এবং একটি করে গাছ বিতরণ করা হয় । আমাদের নবারুণ আনটির দেওয়া গাছটি যত্ন করে বড়ো করার পর ৫ জুন ২০১৭ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নবারুণ সংখ্যায় গাছটির বিষয়ে লেখা পাঠাতে বলেন। আসলে আনটির ইচ্ছা আমরা শিশু কিশোররা সবাই যেন পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিতে সচেতন ও উদ্‌বুদ্ধ হই।

এখন আমি নবারুণ আড্ডায় পাওয়া গাছটি সম্পর্কে কিছু বলি। আম্মুর সাদা ফুল খুব পছন্দ। আমার পাওয়া গাছটি রজনীগন্ধা ফুলের গাছের মতো হওয়ায় অনেক খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু একমাস পর গাছটিতে ফুল ধরার পর বুঝতে পারলাম এটি রজনীগন্ধা গাছ নয়। তবে ফুল দেখে আমি এবং আম্মু দুজনেই খুব খুশি। ফুলের নামটি আমাদের অজানা। আম্মু নাকি অনুষ্ঠানে দেওয়া সবগুলো গাছ বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু ভুলবশত নামগুলো লিখে নিয়ে আসেনি। এর জন্য আম্মুর প্রতি রাগ হয়েছিল। কিন্তু আম্মু বেচারা এত কাজে ব্যস্ত থাকে যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বোটানিক্যাল গার্ডেন এর ভিতরে যে কতো প্রজাতির গাছ রয়েছে তা চোখে না দেখলে বুঝা যায় না। প্রতিটি গাছ ও ফুলের আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। আমার গাছটিতে তিনটি ফুল যখন একসাথে ফোটে তখন মুগ্ধ না হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। ফুলটির রং এত সুন্দর যে তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়।

আমরা সবাই জানি গাছ প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে। দিন দিন পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পরিবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু। এতে নিচু দেশগুলো ভবিষ্যতে তলিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। আমি জীববিজ্ঞান বইতে পড়েছি আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি গাছ সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করেই তার খাদ্য তৈরি করে। আবার গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে। সেই অক্সিজেন আমরা নিশ্বাসে গ্রহণ করেই বাঁচি। যে কারণে গাছ আমাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। আমাদের আনটি সেই জিনিসটিই আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন। যাদের আঙিনায় জায়গা আছে তাদেরকে আনটি ফল বা ঔষধি গাছ দিয়েছেন। আমরা যারা শহরে বাস করি তাদের তো আর বারান্দা ছাড়া উপায় নেই। তবে যে করেই হোক না কেন গাছের মতো উপকারী বন্ধু আমাদের সকলের কাছেই থাকতে হবে। গাছ থাকলেই আমরা প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পারবো। তাই চলো, নবারুণ বন্ধুরা, আমরা সকলে নবারুণ আনটির ডাকে সাড়া দিয়ে গাছ বন্ধুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলি এবং পৃথিবীটাকে নিরাপদ করে তুলি।

নবম শ্রেণি, মণিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা

বন্ধুর ছায়া

অর্ঘ্য দত্ত

গত বছরের ২৮ অক্টোবর ছিল 'নবারুণ আড্ডা'। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর মিলনায়তনে ছোটোদের সেই আড্ডায় হাজির হয়েছিলেন অনেক বড়ো-বড়ো কবি আর লেখক। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানে ছোটোদেরকে তিনি ছড়ার ছন্দে অনেক শপথও করিয়েছিলেন। শপথের মূল কথা, ছোটোদেরকে আগামী দিনের জন্য ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। আর সেই আড্ডার পর ছোটোরা সবাই উপহার হিসেবে পেয়েছিল একটি করে গাছের চারা। ভালো মানুষ হয়ে ওঠার জন্য এই উপহার সত্যিই অসাধারণ। আমিও পেয়েছিলাম একটি চারাগাছ। সেই ছোট্ট চারাগাছটি এখন আমার বাসায় বারান্দার টবে শোভা পাচ্ছে। বেশ বড়ো হয়েছে। পাতাগুলো ঘন সবুজ। টবের ভিতর থেকে গাছটা এখন বাইরে রোদের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে। রোদে সবুজ পাতাগুলো আরও চক চক করে। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠলেই গাছটার সাথে আমার দেখা হয়। আর এভাবেই ওই গাছটা কখন যে আমার বন্ধু হয়ে গেছে আমি জানি না। আচ্ছা, এই চারাটা যদি একদিন অনেক বড়ো একটা গাছ হয় তখনও কি ও আমার বন্ধু থাকবে? আমার মনে হয়, থাকবে। কারণ গাছ তো মানুষের সত্যিকারের বন্ধুই। গাছের মতো বন্ধুর ছায়া আমাদের জন্য খুবই জরুরি।

আমাদের চারপাশে যে গাছ-পালা, নদী-নালা, ঘর-বাড়ি এর সব নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ দুই রকম। প্রাকৃতিক আর মানুষের তৈরি। গাছপালা, নদী-নালা এসব তো আর মানুষ সৃষ্টি করতে পারেনি, পারবেও না। তাই এগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত। আর ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা মানুষের সৃষ্টি, তাই এগুলো মানুষের তৈরি করা পরিবেশ। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির পরে গাছ যে অক্সিজেন দেয়, তা গ্রহণ করেই আমরা বেঁচে আছি। অথচ ভূমিদস্যুরা বনভূমি ধ্বংস করে চলেছে। ইদানীং হরতাল-অবরোধের নামে কীভাবে গাছ কেটে সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়, এটাও কারও অজানা নয়। আহা, কেউ কি গাছের আর্তনাদ শুনতে পায় না! আমাদের দেশে পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন আছে। কিন্তু, এই আইন তো আমাদেরকেই মানতে হবে। তবে আমরা সবাই যে অসচেতন তা কিন্তু নয়। আমাদের দেশে কার্তিক পরামানিকের মতো মানুষও আছে। নরসুন্দর কার্তিক পরামানিক কীভাবে একজন নিঃস্বার্থ প্রকৃতিপ্রেমিক হয়ে উঠতে পারেন, তা অবশ্যই আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত।

শুধু পিচ পরিচর্যায়ই গ্যালনে-গ্যালনে পানির প্রয়োজন হবে একথা চিন্তা করে গতবছর ভরাতের মহারাষ্ট্রে খরার সময় আইপিএলের ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয় সেখানকার তিন ভেন্যু মুম্বাই, পুনে ও নাগপুর থেকে। 'Green Initiatives' এর আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য

আইপিএলের অন্যতম দল রয়েল চ্যালেঞ্জারস ব্যাঙ্গালোর প্রতিবছর তাদের ঘরের মাঠে নিজেদের লাল জার্সি ছেড়ে একটি ম্যাচ খেলে সবুজ জার্সিতে, অধিনায়ক টসের সময় আমন্ত্রিত অধিনায়ককে দেন গাছের চারা। সুন্দরবনের বাঘ বাঁচানোর জন্য ভারতে আছে 'Save the Tigers' নামের একটি সংগঠন। সম্প্রতি উইকিপিডিয়াতে Wiki Loves Earth নামে একটি আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। জাতিসংঘও বছরের বিভিন্ন দিনকে বিভিন্ন প্রাণী ও পরিবেশ রক্ষার দিন হিসেবে ঘোষণা করে থাকে। দিবসগুলো একনজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে–

৩ মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস, ২১ মার্চ বিশ্ব বন দিবস, ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস, ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবস, ২০ মে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি দিবস, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ১৫ জুন বিশ্ব বায়ু দিবস, ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ওজোন দিবস, ৪ অক্টোবর বিশ্ব প্রাণী দিবস এবং ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা এখন অনেক বেশি। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' অর্জন করেছেন, যা আমাদের জন্য অনেক বেশি সম্মানের এবং অনেক বেশি মর্যাদার। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণায় জাতিসংঘকে পরিবেশ বিষয়ক অর্থের জোগান বন্ধ করার কথা বলে বিশ্বজুড়ে নিন্দিত হয়েছেন।

আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে, সবুজ বন বা গাছের ছায়া না থাকলে একটি দেশ যে-কোনো সময় মরুভূমি হয়ে যেতে পারে! গাছ একদিন অক্সিজেন না দিলে আমাদের বেঁচে থাকাও অসম্ভব হবে।

কথায় আছে, 'যত বেশি জানে, তত কম মানে'। কিন্তু এ কথা ভেবে চোখ বন্ধ করে রাখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আমাদের পরিবেশ আমাদেরকেই বাঁচাতে হবে। নতুন পৃথিবী যেনো নতুন প্রজন্মের বাসযোগ্য হয়, তারও চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে 'Charity begins at home'। যে কোনো ভালো কাজের শুরু করতে হয় ঘর থেকে। আমার একার পক্ষে নিশ্চয়ই একটা সবুজ বন তৈরি করা সম্ভব না। কিন্তু আমি একটা সবুজ চারা আমার বাড়ির আঙিনায় যত্ন করে ধীরে-ধীরে বড়ো করে তুলতে তো পারি। এভাবে সবাই মিলে চেষ্টা করলে একটা সবুজ বন গড়ে তোলা কি খুবই অসম্ভব?

অষ্টম শ্রেণি, সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল, ঢাকা

গাছ ভবন

গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ঠেকানোর নয়া কৌশল হিসেবে চীন ভবনের ধাপে ধাপে হাজারো গাছ রোপণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীনের পূর্ব উপকূলীয় শহর নানজিংয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে এমন দুইটি ভবন। যেখানে প্রতি ধাপে রোপণ করা হবে গাছ। একেকটি ভবনে থাকবে ১১ হাজার গাছ। এতে সেখানকার মানুষের অক্সিজেনের চাহিদা মিটবে বলে আশা করছে দেশটি। ভবন দুইটির নকশায় দেখা গেছে, ভবনের বাইরেটা থাকবে গাছপালাবেষ্টিত। ভবনে শপিং কমপ্লেক্স, সুইমিং পুল, জিম, হোটেল, রেস্তোরাঁ, কনফারেন্স হল, প্রদর্শনীর জন্য ফাঁকা জায়গা, বিনোদনমূলক স্থাপনার পাশাপাশি থাকবে বাচ্চাদের স্কুলও। একটি ভবনের উচ্চতা ৬০০ ফুট এবং অপরটির উচ্চতা ৩৫৫ ফুট। ভবনের ছাদে থাকবে মিউজিয়াম ও ব্যক্তিগত ক্লাব। ১ হাজার ১০০ গাছের মধ্যে ৬০০টি বড়ো ও লম্বা এবং ৫০০টি মধ্যম আকারের। আরো থাকবে আড়াই হাজার ছোটো গাছ। এ গাছগুলো থেকে দৈনিক ৬০০ কেজি অক্সিজেন পাওয়া যাবে। এছাড়া বছরে ২৫ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করবে গাছগুলো। নানজিং গ্রিন টাওয়ার নামে এ ভবনের নকশা করেছেন বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি স্টেফানো বোইরি।

ঐশির গাছ

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

ঐশির একটা গাছ আছে। লেবু গাছ, লেবু গাছটাকে ও অনেক যত্ন করে। ঐশি একদিন মামার বাড়ি বেড়াতে গেল। মামার বাড়ি থেকে আসার সময় সে দেখল একটা দোকানে সার বিক্রি করছে। সে মার কাছে বায়না ধরল লেবু গাছের জন্য সে সার কিনবে।

তার মা কিছু সার কিনে দিল। ঐশি কিছু সার গাছে দিল। গাছ অনেক বৃদ্ধি পেল। গাছটাকে ও অনেক ভালোবাসে। ঐশির গাছটা অনেক বড়ো। ঐশির গাছটাতে নানারকম পাখি বাসা বাঁধে। পাখি গান গায়। রাতে ঘুমায়। নানারকম প্রজাপতি রং-বেরঙের জামা পড়ে নাচানাচি করে। মৃদু বাতাসে যখন পাতাগুলো দোল খায়, তখন মনে হয় গাছের পাতাগুলো নুপুর পায়ে নাচছে। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয় তখন গাছটা গোসল করে, তার সাথে মনে হয় আমিও গোসল করি। এইভাবে আমাদের আর গাছের দিন কেটে যায়। আমি আর ঐশি ভাবছি কবে ফুল হবে। লেবু ধরবে। আমরা লেবু খাবো। এই নিয়ে আমি ঐশিকে একটা কবিতা উপহার দিলাম।

লেবুগুলি খাবো
লেবু নিয়ে যাবো
লেবুতে ভিটামিন আছে
তাই তো সবাই বাঁচে।

একদিন ঐশি আমাদের বাসায় বেড়াতে আসল। ঐশি আসার পর আকাশ কালো হয়ে গেল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বললাম ঐশি আজ তুমি আমাদের বাসায় থেকে যাও। আকাশ অনেক কালো হয়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ঐশি আমার অনুরোধ রাখল। দুজন মিলে অনেক গল্প করলাম লেবু গাছ নিয়ে।

ঐশি বলল এখন আমাদের একটি মাত্র লেবু গাছ। একদিন ছাদ জুড়ে অনেক গাছ লাগাবো। এই শহরটাকে গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিব। আমার পাড়ার নাম হবে লেবু বাগান। এই নিয়ে আমাদের অনেক গল্প হলো। রাত অনেক হয়েছে, চলো আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে উঠে দেখি অনেক গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা দৌড়ে গেলাম ঐশিদের ছাদে। দেখলাম লেবু গাছটা দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে পরে আছে অন্য এক জায়গায়। আশপাশে অনেক পাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। শুধুমাত্র একটু গাছের গোড়া লেগে আছে মাটির সাথে। আমাদের অনেক মন খারাপ হলো। ঐশি কাঁদছে। আর ঝড়ে পরে থাকা পাতাগুলো কুড়াচ্ছে। সাথে আমিও কুড়িয়ে দিলাম ছোটো ছোটো ফুল আর ছোটো ছোটো লেবু। সারাদিন ঐশি কিছু খায়নি।

আর পড়তেও বসেনি। সবাই মিলে আমাদের অনেক সান্ত্বনা দিল। কিন্তু সান্ত্বনা দিলে কী হবে? ঐ আদরের লেবু গাছটা তো কেউ দিতে পারবে না।

তৃতীয় শ্রেণি, বিএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

গাছ লাগাবো বেশি

সা'দ সাইফ

পরিবেশটাকে বাঁচাতে হলে
কিংবা তাকে সাজাতে হলে
গাছ লাগাবো বেশি,
গাছের অভাবে পুরো দেশ
করছে যেন হাপিত্যেশ
কারণটা যে দেশি।

পরিবেশের বন্ধু সেরা
নাম যে তার জগৎ জোড়া
এটা সবাই জানি,
গাছ আমাদের দেশ ও দশের
উন্নয়ন এবং শান্তি বশের
কয়জনই বা মানি?

এই যে তুমি নিচ্ছ বাতাস
কিংবা তুমি দিচ্ছ বাতাস
সবই গাছের কারণ,
আজ থেকে শপথ করি
গাছ রোপণের সুপথ ধরি
করব না গাছ নিধন।

একাদশ শ্রেণি, ডা.আফিল উদ্দীন কলেজ, বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

গাছ

আব্দুস সালাম

গাছ দেয় বায়ু
আমরা পাই আয়ু,
গাছ দেয় ফল
আমাদের হয় বল।
গাছ দেয় ওষুধ
সারে অসুখ,
গাছ দেয় কাঠ
আমরা বানাই আসবাব।
আগাছা দেয় জ্বালানি
রান্না করি বিরিয়ানি।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

নিরাপদ পরিবেশ চাই

নিতু চৌধুরী

ছুটির দিনে বাবার সাথে
যাচ্ছি আমি ঘুরতে
রাস্তার গাড়ি এসে
ধুলো দিল মুখে।

ঘোরাঘুরির মধুর সময়
চালক দিল হর্ন
তারপরে যে শুনতে গেলে
লাগে একটু কম।

ফেরার সময় বাড়ি
তাকিয়ে দেখি খালে
খালের পানি দূষিত
কলকারখানার জলে।

আমার দেশের গাড়িতে চাই
অল্প স্বরের হর্ণ,
বায়ু চাই শ্বাসের যোগ্য
পানি চাই দূষণমুক্ত...

পঞ্চম শ্রেণি, চকপাড়া আইডিয়াল পাবলিক স্কুল, চকপাড়া, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর

পরম বন্ধু

ইশরা হোসেন

গাছ আমাদের পরম বন্ধু
গাছ বাঁচায় প্রাণ
গাছের তরে তাই আমরা গাইছি জয়গান।

গাছ দেয় ফুল, ফল, নির্মল বায়ু আর ছায়া
সবুজ শ্যামল প্রকৃতির মায়া।

গাছ আমাদের অমূল্য ধন
তাই করো না গাছ নিধন।

বিষাক্ত বায়ুতে ছেয়ে গেছে বিশ্ব
ধীরে ধীরে আমরা হচ্ছি নিঃস্ব।

তাই গাছ লাগাই, দেশ বাঁচাই
এ শপথে হই বলীয়ান।

দশম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা।

মাকড়ি

সারা হোসেন সামান্তা

যন্ত্রটা বানানো এইমাত্র শেষ করেছে নীল। এই যন্ত্রটা যে-কোনো জীবের কথা বুঝতে সক্ষম। এই যন্ত্রটা সবচেয়ে বেশি কাজ করবে গাছের উপর। নীল এখনো জানে না যন্ত্রটা কাজ করবে কিনা। কারণ নীল এখনো যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পায়নি। কারণ, ওরা যে গ্রহটাতে থাকে সেখানে গাছ নেই। একটাও নেই। 'কুহেলিকা' নামের এই গ্রহটিতে এর নামের মতোই কুয়াশা ভরা থাকে। এখানে পৃথিবীর মতো বাড়িঘর তৈরি করে মানুষ বসবাস করে। তবে শুধু নামেই মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি। আসলে মানুষ এখন এসবের কিছুই করে না। সবই করে রোবটেরা। আর তাই এখানে গাছপালাও নেই। এখানে সবকিছুই পরীক্ষাগারে তৈরি করা হয়। মানুষ এখন চাষবাস করে না।

এখানে কিছুই প্রাকৃতিক নয়। এ গ্রহের বাচ্চারা যেন প্রকৃতিকে একদমই ভুলে না যায়, সেজন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন এখানকার বাচ্চাদের প্রকৃতি দেখাতে পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে পৃথিবীর দূরত্ব খুব বেশি না। তাই খুব দ্রুত যাওয়া যায়, আজ সেই দিন। নীল তাই দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। সে এই দিনটার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। সে তার বন্ধু মাইকেলকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মহাকাশযানে উঠে পড়ল। মহাকাশযানটা খুব দ্রুতই পৌঁছে গেল পৃথিবীতে। পৃথিবীতে পৌঁছেই নীল গাছের খোঁজে নামল, পৃথিবীতে গাছ আছে। তবে খুব বেশি নেই, খুঁজতে খুঁজতে নীল ছোট্ট একটা গাছের চারা খুঁজে পেল। সে ভাবল গাছটাকে নিয়ে যাবে।

যদিও পৃথিবী থেকে কোনো কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে না, এরকম একটা আইন আছে। নীল তাই ভাবল যে, যন্ত্রটা পরীক্ষা করে গাছটা আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। তাহলে আইনও ভঙ্গ করা হবে না, আবার ওর যন্ত্রও পরীক্ষা করা হবে। ও গাছের চারাটা নিয়ে গেল ওদের গ্রহে। ওর ঘরে নিয়েই ও লুকিয়ে রাখল সেটাকে। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তখন ও আবিষ্কার করল গাছটার প্রতি অদ্ভুত একটা মায়া জন্মে গেছে। ও খুব সাবধানে বের করল গাছটাকে। যন্ত্রটা লাগালো। তারপর সাথে সাথেই গাছটা বলল, 'পানি, পানি, পানি দাও।' নীল পানি দিল গাছটাকে। গাছটা ওর কাছে সূর্যের আলোর জন্য চেঁচামেচি শুরু করল এবং তার ফলে সবার ঘুম ভেঙে গেল। সবাই নীলের কাছ থেকে গাছটাকে ছিনিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু নীলের কী হলো কে জানে, ও প্রচণ্ড বেগে দৌড়াতে লাগল গাছটাকে নিয়ে। ও গাছটাকে নিয়ে এমন কোথাও যাবে যেখানে কেউ ওর কাছ থেকে গাছটাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কেউ না...

দশম শ্রেণি, একে হাইস্কুল, দনিয়া, ঢাকা

গাছের নাম পতাকা

সামিহা তাসনিম সিনহা

২৮ অক্টোবর শুক্রবার ২০১৬, দিনটি অন্যান্য দিনের মতো সাধারণ হলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে অসাধারণ রূপ ধারণ করতে থাকে। এ দিন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে 'নবারুণ আড্ডা' অনুষ্ঠিত হয়। নবারুণের একজন নিয়মিত পাঠক এবং লেখক হিসেবে আমি সেখানে যোগদান করি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন নামিদামি সব লেখক, কবি, বহু ক্ষুদে লেখক ও শিল্পী। নানা আলোচনায় মুখর ছিল অনুষ্ঠানটি। তথ্যমন্ত্রী আমাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ও বাল্যবিবাহ রোধ করতে বলেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে নবারুণের পক্ষ থেকে সবাইকে একটি করে গাছের চারা দেওয়া হয়। বাসায় আনার পথে গাছটিকে নিয়ে নানারকম ভাবনায় ভরে গিয়েছিল চারপাশ। সেদিন বিকেলেই গাছটি বাসার টবে লাগালাম। এটা ছিল একটা ফুলগাছ। আমাদের যত্ন...

গাছটি ফুলে ফুলে ভরে উঠল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কোনো নাম খুঁজে পেলাম না তার। তখন মনে মনে ঠিক করলাম আমি নিজেই একটা নাম দেব তাকে। গাছটির পাতাগুলো গাঢ় সবুজ আর ফুলগুলো টকটকে লাল। মনে হলো এ গাছের নাম পতাকা দেওয়া যেতে পারে। সবুজ পাতায় ঘেরা একগুচ্ছ লাল ফুল তো বাংলাদেশের পতাকাকেই তুলে ধরে। গাছটির লাল ফুল আমাকে মুগ্ধ করে। গন্ধবিহীন ফুলটির কাছে গিয়ে প্রাণভরে নিশ্বাস নিই। ভাবি, ও আমার খুব ভালো বন্ধু। ও আমার নিশ্বাসের জন্য অক্সিজেন দেয়। বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে।

১৯ মে ২০১৭ 'নবারুণ পরিবেশ সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ করতে আবারো উপস্থিত হই ডিএফপিতে। উৎসবমুখর পরিবেশে অনেক খুদে বন্ধুদের সাথে মিলিত হওয়া, লিপি ম্যাডামের সাথে সাক্ষাত- সেই আনন্দঘন মুহূর্ত। এ দিনও সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। তিনি প্রচণ্ড গরমে কিছুটা অস্থির থাকলেও আমাদের সাথে কথা বলার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন। মিডিয়ার ক্যামেরাম্যানদের বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি ছবি নিয়ে আপনারা সড়ে দাঁড়ান। আমি শিশুদের সাথে কথা বলব। তারপর আমাদের সাথে আলাপকালে তিনি যেন গরমের কথা ভুলেই গেলেন। পরিবেশ রক্ষায় শিশুকাল থেকেই কাজ করতে হবে, বলেন তথ্যমন্ত্রী। এসময় ছড়ায় ছড়ায় তিনি আমাদের শেখান-ভালো করে লেখাপড়া শিখব/ পশুপাখি-গাছপালার মায়া করব/ ঘরবাড়ি আশপাশ ঠিকঠাক রাখব।

উঁচুমানের মানুষদের কাছ থেকে এসব উপদেশ শুনলে নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। মনে হয়, দেশ ও বিশ্ব গড়ায় আমিও ভূমিকা রাখতে পারি।

কিশোর নবারুণ পত্রিকার সম্পাদক নাসরীন জাহান লিপি ম্যাডামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত করানোর জন্য। নতুন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

নবম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

জায়গা বদল

চান্দ্রেয়ী পাল মম

রাত দুইটা বাজে। সারাহ্ এখনো পড়ার টেবিলে। ও এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। পরশু বায়োলজি পরীক্ষা। রাত জেগে পড়াটা অভ্যাস হয়ে গেছে ওর। পড়তে পড়তে ক্লান্ত লাগছিল বলে উঠে বারান্দায় চলে গেল সে। একটু ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগালেই ক্লান্তি চলে যাবে। সারাহ্দের বাসার চারপাশটা বেশ খোলামেলা। ৪ তলার ফ্ল্যাটটাতে তাই প্রচুর বাতাস। সারাহ্ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখছিল। হঠাৎ ওর মনে হলো কেউ যেন ফিসফিসিয়ে কথা বলছে।

-এই বকুল, আছিস?

-হ্যা রে করবী। কি খবর বল!!!

সারাহ্ অবাক হয়ে দেখে, ও আর ওর ছোটো বোন নবারুণ আড্ডা থেকে যে গাছ দুটো উপহার পেয়েছিল, সেগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে! একটা হচ্ছে বকুল গাছ আর একটা করবী গাছ। ওদের বারান্দার টবে লাগানো হয়েছে গাছগুলো। সারাহ্ কান পেতে শুনতে থাকে কথাগুলো।

বকুল গাছটি বলছে,

-আর খবর। ভালো নেই রে আমি।

-কেন, কিসের দুঃখ তোর?

-দেখ আমাকে এই ছোটো টবের মধ্যে এনে রেখেছে। কিন্তু এই ছোটো জায়গায় আমি বড়ো কীভাবে হব? শিকড়ই বের হতে পারছে না।

-আসলেই বকুল। আমারো একই অবস্থা। এই ছোটো ছোটো টবে আমরা বড়ো হতে পারব না।

-কিন্তু ওরা না সরালে আমরাও এখান থেকে কোথাও যেতে পারব না।

-আমাদের দুঃখটা কেউ বুঝবে না...

সারাহ্র খুব মন খারাপ হলো এই কথাগুলো শুনে। এটা ওদের কারোর মাথায় এল না কেন? সত্যিই তো! গাছগুলো এত ছোটো জায়গায় বড়ো হবে কীভাবে? পরের দিন সারাহ্ ওর বাবাকে কথাগুলো বলল। বাবা শুনে বললেন,

-আচ্ছা ঠিক আছে। আর কিছুদিন পর আমি যখন বাড়ি যাবো, তখন গাছগুলোকে ওখানে বড়ো জায়গায় পুতে দিয়ে আসব। ঠিক আছে?

-ঠিক আছে।

এখন খুব সহজেই গাছগুলো বড়ো হতে পারবে। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তখন চুপিচুপি বারান্দায় এল সারাহ্। বাইরে থেকে চারপাশের বাসাগুলোর আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। গাছ দুটোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সারাহ্ গাছ দুটোর সামনে বসল। এরপর আস্তে করে বলল—

-তোমরা আর চিন্তা করো না। আমার বাবা কিছুদিনের মধ্যে তোমাদের নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাবে। আর ওখানে নিয়ে মাটিতে পুতে দিবে। তখন তোমরা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হতে পারবে। আর অনেক অনেক ফুল ফোটাবে।

গাছ দুটো একসাথে থ্যাংক ইউ বলে উঠল। সারাহ্র মুখটা হাসিতে ভরে গেল।

দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

লেবুচাঁদ এবং স্বপ্ন

এ. এইচ.এম. মুনাইমুল আজম

গায়ে কে যেনো সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে, আধো আধো চোখে তাকিয়ে দেখলাম একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মতো করে। গলায় লাল টাই। মাথায় কালো টুপি। প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু অবসন্ন ভাব কেটে উঠতেই লাফ দিয়ে উঠলাম। একি!! এ যে মিস্টার লেবুচাঁদ, আমার গাছ! হাত দিয়ে দুই চোখ ডলে, পুনরায় চোখ খুললাম (ভাবলাম দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে না তো!)। এ তো আমার লেবুচাঁদ (আমার দেওয়া নাম)। একেবারে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমি তখনই বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ালাম। লেবুচাঁদ বলল, চিনতে পারছেন আমায়?

আমি কোনোমতে বললাম, লেবুচাঁদ না! তুমি এইখানে... রাজশাহী-তে?

কী করব বলুন, আপনার কবিতাটি শুনতে চাচ্ছিলাম।

পড়াশুনার উদ্দেশ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহীতে আসি। বর্তমানে রাজশাহী কলেজে পড়ছি। ভাড়াবাড়িতে উঠেছি। কোনো উঠান না থাকায় লেবুচাঁদকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ রেখে এসেছি। বাবা তার দেখভাল করেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে গেলে সন্ধ্যার পর লেবুচাঁদ কে নিয়েই পড়ে থাকি। সেরকম একদিন হঠাৎ করে লেবুচাঁদের সাথে কাল্পনিক গল্প করতে করতে, তাকে নিয়ে একটি ছড়া বানিয়ে ফেলি-

'লেবুচাঁদ আমার লক্ষী গাছ,
ঝগড়াতে নেই, কিংবা কারো সাতে-পাঁচে;
চুপটি করে ঠাঁই দাঁড়িয়ে, সবুজ পাতায় ছেয়ে,
লেবুচাঁদের টক গন্ধে, মনকে মাতিয়ে
রাখে।'

গত দুই মাস ব্যস্ততার কারণে চাঁপাই যাওয়া হয়নি। দেখা হয়নি লেবুচাঁদের সাথে। আসলে কর্মব্যস্ততার ভিড়ে আমরা হারিয়েছি পবিত্র বন্ধন। প্রতিযোগিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে, ভুলতে বসেছি প্রকৃত বন্ধুত্বের স্বাদ। দিন শেষে যখন বোঝাসহ ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে পুনরায় পড়তে বসি, তখন ক্ষণিকের জন্য মনে উঁকি দেয় সে বন্ধুত্ব। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে, প্রতিযোগিতার স্রোতে তা নিতান্তই তুচ্ছ। লেবুচাঁদ পুনরায় শুধালো, কবিতাটি শোনান না; কবিতাটি না শুনলে আমার ফুলগুলি যে ফুটছে না!

আমি তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। এরকম প্রতিনিয়ত কত যে ফুল ফুটে না! দিন শেষে ঝরে পড়ে নিজের অক্ষমতার পরিচয় দেয়। আর, একটি কবিতা; হ্যাঁ! একটি কবিতাই পারত তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাদের কে বাঁচাতে পারিনি। তো কী হয়েছে? লেবুচাঁদের ফুলগুলোকে ঝরতে দিব না। কবিতাটি বলা শুরু করেছি, এমন সময় আম্মু দরজায় টোকা দিয়ে বললেন,

'কী হয়েছে মাহিদ? এতো রাতে কাকে কবিতা শোনাচ্ছিস?'

আমি লেবুচাঁদের কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে কেউ নেই, শুধু চাঁদের আলো জানালার ফাঁক গলে আমার বিছানার কিনারায় পড়ছে। আমি আম্মুর দিকে তাকিয়ে স্বলজ্জ হাসি হাসলাম। আম্মু কী বুঝলেন জানি না! শুধু বললেন,'শুয়ে পড়।'

আম্মু চলে যাওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আজ বোধহয় পূর্ণিমা! ঐ তো দূরে কী সুন্দর চাঁদ! এ রকম এক জোছনা রাতে চাঁদের আলো লেবুর ফুলে ফুটে ছিল বলে, নাম দিয়েছিলাম লেবুচাঁদ। তখন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'যা, তোর নাম দিলাম লেবুচাঁদ। যা, জোছনার আলোর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে যা।'

মন খারাপ হয়ে গেল। দিন শেষে ডাইরির আড়কে অসমাপ্ত দিনলিপিকে পুনরায় অপূর্ণতা দান করলাম। শেষ লাইনে লিখে রাখলাম, **'লেবুচাঁদ এবং স্বপ্ন...'**

দ্বাদশ শ্রেণি, রাজশাহী কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ভূমিকম্প : প্রধানমন্ত্রীর ১৯ নির্দেশনা

সুলতানা বেগম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ মে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল'-এর সভায় অংশগ্রহণ করে। সভায় প্রধানমন্ত্রী ভূমিকম্প পরবর্তী ক্ষতি কমাতে ১৯টি নির্দেশনা প্রদান করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে। তিনি ভূমিকম্প পরবর্তী ক্ষতি কমানোর ওপর জোর দেন এবং সম্ভাব্য ভূমিকম্পে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে হবে বলে উল্লেখ করেন। এজন্য বিদ্যুৎ ও গ্যাসলাইন এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঐ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মহানগরীর ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোয় রাজউক বা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লাল রঙের সাইনবোর্ড লাগানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। যাতে লেখা থাকবে-'ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং এ ভবনে বসবাস করা নিরাপদ নয়।' সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে অন্তত দুবার সুবিধাজনক সময়ে ভূমিকম্পের মহড়া অনুষ্ঠান আয়োজনে অনুশাসন দেওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে সারাদেশে একযোগে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূকিম্পের সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম হাতে নেওয়ার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সভায় উপকূলীয় ৩৭টি উপজেলায় ৩২৯১টি ইউনিট চলমান থাকার বিষয়টি আলোচিত হয় এবং অতিরিক্ত ৩৯৩টি নতুন ইউনিট গঠন করে ৫৮৯৫ জন সেবক নিয়োগের কথা বলা হয়। এছাড়া সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে সব সময় সচল ও প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা নিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর এসব নির্দেশনা মনিটরিং করার জন্য ১৯ জন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর এসব নির্দেশনার কথা ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ভূমিকম্পের সময় আপনার করণীয়:

- ভূকম্পন অনুভূত হলে আতঙ্কিত হবেন না।
- ভূকম্পনের সময় বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোনো আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিন।
- রান্না ঘরে থাকলে গ্যাসের চুলা বন্ধ করে দ্রুত বেরিয়ে আসুন।
- বীম, কলাম ও পিলার ঘেঁষে আশ্রয় নিন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে স্কুল ব্যাগ মাথায় দিয়ে শক্ত বেঞ্চ অথবা শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন।
- ঘরের বাইরে থাকলে গাছ, উঁচু বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে খোলাস্থানে আশ্রয় নিন।
- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল, মার্কেট ও সিনেমা হলে থাকলে বের হওয়ার জন্য দরজার সামনে ভিড় কিংবা ধাক্কাধাক্কি না করে দুহাতে মাথা ঢেকে বসে পড়ুন।
- ভাঙা দেয়ালের নিচে চাপা পড়লে বেশি নড়াচড়ার চেষ্টা করবেন না। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন, যাতে ধুলা বালি শ্বাসনালিতে না ঢোকে।
- একবার কম্পন হওয়ার পর আবারও কম্পন হতে পারে। তাই সুযোগ বুঝে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নিন।
- উপরের তলায় থাকলে কম্পন বা ঝাঁকুনি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তাড়াহুড়ো করে লাফ দিয়ে বা লিফট ব্যবহার করে নামা থেকে বিরত থাকুন।
- কম্পন বা ঝাঁকুনি থামলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ুন এবং খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিন।
- গাড়িতে থাকলে ওভারব্রিজ, ফ্লাইভার, গাছ ও বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে গাড়ি থামান। ভূকম্পন না থামা পর্যন্ত গাড়ির ভিতরে থাকুন।
- ব্যাটারিচালিত রেডিও, টর্চলাইট, পানি ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম বাড়িতে মজুদ রাখুন।
- বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ করুন।

গল্প

নেপালি বন্ধু উথান

মিজানুর রহমান মিথুন

গত বছর এপ্রিলের শেষে অতশী বাবার সঙ্গে নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিল। হিমালয় পর্বত দেখা নেপাল ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্যে ছিল। নেপালে গিয়ে তারা রাজধানী কাঠমান্ডুর হোটেল 'হিমালয়'-এ উঠেছিল। এটি এখানকার বিখ্যাত হোটেল। এ হোটেলেই ভ্রমণের পাঁচ দিন তারা থেকেছে। প্রথম দিন রাতেই অতশী উথান মায়াকে ফোন দিয়েছিল। উথান মায়ার বাড়ি নেপালের অন্যতম শহর নাগরকোট। নাগরকোট থেকে কাঠমান্ডু আসতে দুই ঘণ্টা লাগে। অতশীর ফোন পেয়ে সকালেই উথান এসে হোটেলে হাজির।

এবার বলে নেই উথানের সঙ্গে অতশীর কীভাবে পরিচয়। ক্লাস ফাইভ থেকেই অতশীর পেন ফ্রেন্ড বা কলমীয় বন্ধুত্ব স্থাপন করার শখ। এতে এক সময় উথানের সঙ্গে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে পরিচয় ঘটে। এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এ বছর অতশী অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। উথান এ বছর দশম শ্রেণির ছাত্র।

উথান হোটেলে আসার পর অতশীর বাবা উথানকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ছোটো মানুষ একা একা কীভাবে এত দ্রুত চলে আসলে?' উথান সাবলীল উত্তরে জানালো, বিশ্বের নানা দেশে তার অনেক কলমীয় বন্ধু রয়েছে। তারা কেউ নেপাল ভ্রমণে এলে উথানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে উথান তাতে সাড়া দেয়। তাদের ভ্রমণের সময় উথান বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। নেপালের উথানের এই কথা শুনে অতশীর বাবা ভীষণ মুগ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন তাহলে তাদের ভ্রমণটা খুব ভালোই হবে।

অতশী যতদিন নেপালে ছিল, ততদিন উথান তাদের সঙ্গেই ছিল। উথান সঙ্গে থাকায় অতশীরা নেপালের সব ঐতিহাসিক জায়গা সম্পর্কে ভালো ধারণা পেয়েছে। উথান নেপালি ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভালো করে আয়ত্ত করে ফেলেছে। ফলে অতশীদের সবকিছু বুঝতে সুবিধা হয়েছে। অন্যান্য জায়গা ভ্রমণের পাশাপাশি উথান কয়েকবার চেষ্টা করেছে নাগরকোটের বাড়িতে অতশীদের নিয়ে যেতে। কিন্তু সময়ের অভাবে তারা নাগরকোট যেতে পারেনি। অতশী বিনয়ের সঙ্গে উথানকে বলেছে, এর পরে তারা নেপাল ভ্রমণে এলে উথানের বাড়িতে বেড়াতে যাবে।

নেপাল থেকে দেশে ফেরার সময় অতশীকে উপহার হিসেবে নেপালের প্রসিদ্ধ বেশ কয়েক প্যাকেট নানা ধরনের চকলেট দিয়েছিল উথান।

অতশী ক্লাস থ্রি তে পড়া থেকে ডায়েরি লেখে। নেপালে যাওয়ার সময়ও ডায়েরি নিতে ভুল করেনি। নেপাল ভ্রমণের সবকিছু তারিখ সহকারে তার ডায়েরিতে লিখে রেখেছিল।

আজ সকালে ঘুম থেকে জেগেই ডায়েরি খুলে দেখে নেপাল ভ্রমণ করে এসেছে এক বছর পার হয়ে গেছে। ডায়েরির একটা একটা পাতা উলটে দেখছে, কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছিল। এদিকে অতশীর বাবা ঘুম থেকে জেগে টেলিভিশন অন করেছেন। অন করেই দেখতে পেলেন টেলিভিশনে সংবাদ চলছে। সংবাদ শিরোনামে বলা হচ্ছে 'নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে সাড়ে পাঁচ হাজার নিহত'। এই সংবাদ দেখে অতশীর বাবা আঁতকে উঠলেন। অতশীকে সংবাদ দেখার জন্য টিভি ওয়াচিং রুমে ডাকলেন। সংবাদে বিস্তারিত অংশে দেখানো হচ্ছে—

'ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে কাঠমাণ্ডুর দরবার স্কয়ার। রাজধানী কাঠমাণ্ডুর ধরহারাসহ পনপালের বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে ভয়াবহ এই ভূমিকম্প। এরমধ্যে অনেকগুলো স্থাপনা চিরতরে হারিয়ে গেছে। ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঠমাণ্ডুর জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা বসন্তপুরের দরবার স্কয়ারের ৮০ শতাংশ মন্দিরই ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পাওয়া দরবার স্কয়ার দেশি-বিদেশি পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের স্থান। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কাষ্ঠমণ্ডপ, পঞ্চচেল মন্দির, নয়তলাবিশিষ্ট বসন্তপুর দরবার, দেশা অবতার মন্দির, কৃষ্ণমন্দির এবং শিব প্রভাতি মন্দিরের পেছনে অবস্থিত দুটি দেয়াল। কুমারী মন্দির, তালেজু ভবানীসহ আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপনা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পের আঘাতে ধসে পড়া ধরহারা টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে ২৪টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আরো অন্তত ১০০ লোক টাওয়ারটিতে ওঠার জন্য টিকিট কিনেছিল। তবে ভূমিকম্প আঘাত হানার সময় তারা এতে না ওঠায় বেঁচে গেছে। ৮৩ বছর আগে ১৯৩৪ সালেও একবার শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ধরহারা টাওয়ার। সে সময় এটি ভেঙে কয়েক খণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার গড়ে তোলা হয় ধরহারাকে। একসময় কাঠমাণ্ডুর আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো গুটি কয়েক স্থাপনার একটি ছিল এটি। পাটান ও ভক্তপুর এলাকার বেশ কয়েকটি মন্দির ও ঐতিহাসিক ভবনও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গুসালা এলাকার জয় বাগেশ্বরী মন্দিরের চূড়া এবং পশুপতিনাথ মন্দির, স্বয়ম্ভুনাথ, বুদ্ধনাথ স্তূপ, রত্নমন্দির, রানি পোখারি এবং দরবার হাইস্কুলের অংশ বিশেষও ধ্বংস হয়ে গেছে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে। পাটানের চার নারায়ণ মন্দির, যোগ নরেন্দ্র মল্লার ভাস্কর্য, তালেজু মন্দির, হরি শঙ্কর ও উমা মহেশ্বর মন্দির এবং বাঙ্গামাতি এলাকার মাছিন্দ্রনাথ মন্দিরও ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে ত্রিপুরেশ্বর এলাকার কাল মশান ঘাট। এটি মোগল স্থাপত্যের আদলে তৈরি করা হয়েছিল। ওই এলাকার কাছে অবস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী স্থাপনাটিও বড়ো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

ভক্তপুর এলাকার ফাসি দেব মন্দির, চরধাম মন্দির ও ১৭ শতকের ভাতশালা দুর্গামন্দিরসহ অনেকগুলো ঐতিহাসিক স্থাপনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া উপত্যকার বাইরে গোর্খা এলাকার মনকামনা মন্দির, গোর্খা দরবার, কাবেরি পালনচক এলাকার পালনচক ভগবতী, পাল্পা এলাকার রানি মহল, জনকপুর এলাকার জানকী মন্দির, মাকওয়ানপুর এলাকার চুরিয়ামাই, দোলাখা এলাকার দোলাখা ভীমসেনস্থান এবং নোয়কোট দরবার আংশিক ক্ষতি হয়েছে।

এসব ঐতিহাসিক স্থাপনার অনেকগুলোই চিরদিনের

জন্য হারিয়ে যেতে পারে। কারণ, এগুলোর পুনর্গঠন যেমন কারিগরি দিক দিয়ে অনেক কঠিন, তেমনি ব্যয়বহুলও। কাঠমান্ডু, ভক্তপুর ও ললিতপুরের যেসব স্থাপনাকে বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, তার বেশির ভাগকেই হারিয়ে ফেলেছি আমরা। এগুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

অতশী এসে এই সংবাদ দেখে চিৎকার করে উঠল। এখন সংবাদে দেখানো হচ্ছে ভূমিকম্পে নাগরকোটের লন্ডভন্ড অবস্থা। এই দৃশ্য দেখেই অতশী হাইমাউ করে কেঁদে ফেলল।

অতশীর এই কান্না দেখে বাবার চোখেও জল এসে গেল। বাবা অতশীকে টেনে কোলে তুলে নিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বাবা বললেন—

কেঁদো না আম্মু। প্রকৃতি মাঝেমধ্যে আমাদের মানুষের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। কয়েক বছর আগে আমাদের দেশে সিডর হানা দিয়েছিল। তাতে অগণিত মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষও মারা গিয়েছিল। নেপালে এমনটাই ঘটেছে।

এরপর অতশী তার বাবাকে বলল-

-বাবা, তাহলে একবার উথানের নম্বরে একটা ফোন দাও। ভূমিকম্পে ওদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা জেনে দেখি। উথানের সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

অতশীর বাবা তার মোবাইলটি এনে উথানকে কল দিলেন। কয়েক বার কল দিয়েও সংযোগ পেলেন না। এই কথা শুনে অতশী আরো কান্নায় ভেঙে পড়ে। কেঁদে কেঁদে বাবাকে বলছে-

-বাবা, এর আগে উথানকে যে-কোনো সময়ে ফোন দিলে পাওয়া যেত। আজ কেন পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে উথান কি ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে মারা গেছে...।

অতশী কিছু ভাবতে পারছে না।

এরপর বাবার কাছ থেকে মোবাইলটি নিয়ে উথানের নম্বরে একের পর এক কল দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উথানের নম্বরে কোনো ভাবে ফোনের সংযোগ পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে অতশী তার পড়ার টেবিলে গিয়ে ড্রয়ার থেকে উথানের দেওয়া চিঠিগুলো বের করে পরম মমতায় হাত বুলায়। আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ভূমিকম্প

বেণীমাধব সরকার

হঠাৎ করে কেঁপে ওঠে
শান্ত বসুন্ধরা
ঘরবাড়ি সব শুরু করে
বেজায় নড়াচড়া।
নাচতে থাকে দালানকোঠা
নাচতে থাকে ঘর
ভেঙে পড়ে বাড়িগুলো
ভুঁই জমিনের পর।
ভয়ার্ত সব মানুষগুলো
দাঁড়ায় পথে এসে
কেউবা আবার চ্যাপটা হয়ে
ইট-পাথরে মেশে।
চতুর্দিকে মরণ পীড়ার
দারুণ কোলাহল
দীর্ণ করে নীল—নীলিমার
বিশাল আকাশ তল।
কেউ জানে না কেমন করে
হঠাৎ কোথা হতে
রোজ কিয়ামত নেমে আসে
এই দুনিয়ার পথে।
এক নিমিষে নেয় কেড়ে সে
লক্ষ লোকের প্রাণ
গ্রাম জনপদ যায় হয়ে প্রায়
নীরব গোরস্থান।

পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের অবদান

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়তি জনসংখ্যার কারণে পরিবেশের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জনসংখ্যার আধিক্য ও মানুষের অপরিণামদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে ঝুঁকিবহুল হয়ে উঠছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এর ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও পৃথিবীর জলভাগের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে জলবায়ুর গতি প্রকৃতি। তাই উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পরিবেশের সুরক্ষা ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বন্যপ্রাণী প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বন্যপ্রাণীর বেআইনি ব্যবসার ফলে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'গো ওয়াইল্ড ফর লাইফ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষা ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষাকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের বিপন্নতার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নৈসর্গিক পরিবর্তন রোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবেশ রক্ষায় সরকারের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে পলিথিন ব্যবহার বন্ধ, বহুতল ভবন নির্মাণ, নদী দখল, বন দখলসহ পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে সরকার বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আইনি ব্যবস্থাপনাও জোরদার করেছে। বিশেষ করে, ঢাকার নাগরিক জীবনে পরিবেশগত সমস্যার বিষয়টি বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিবেশ দূষণের বিষয়ে সরকার মৌলিক সমস্যা হিসেবে নির্ধারণ করেছে- পানি দূষণ, বায়ুদূষণ, মাটি দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পাহাড় কাটা, বনভূমি উজাড়, শব্দদূষণ এবং জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট।

পরিবেশ উন্নয়নে যুতসই বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকার 'ক্লাইমেট ডিপেন্ডামেসি' শুরু করেছে। চলতি শতকের সবচেয়ে আলোচিত এ ইস্যু সামনে তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছে বাংলাদেশ। ক্লাইমেট ডিপেন্ডামেসির কারণে উন্নত বিশ্বের পরিবেশ দূষণ কর্মকাণ্ড বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা এজেন্ডাভুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ এ নেতৃত্বের অবস্থান নিশ্চিত করে। সরকার দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের আর্থিক সমর্থনও নিশ্চিত করেছে।

পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ তাই জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' পুরস্কার আমরা অর্জন করেছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করাই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

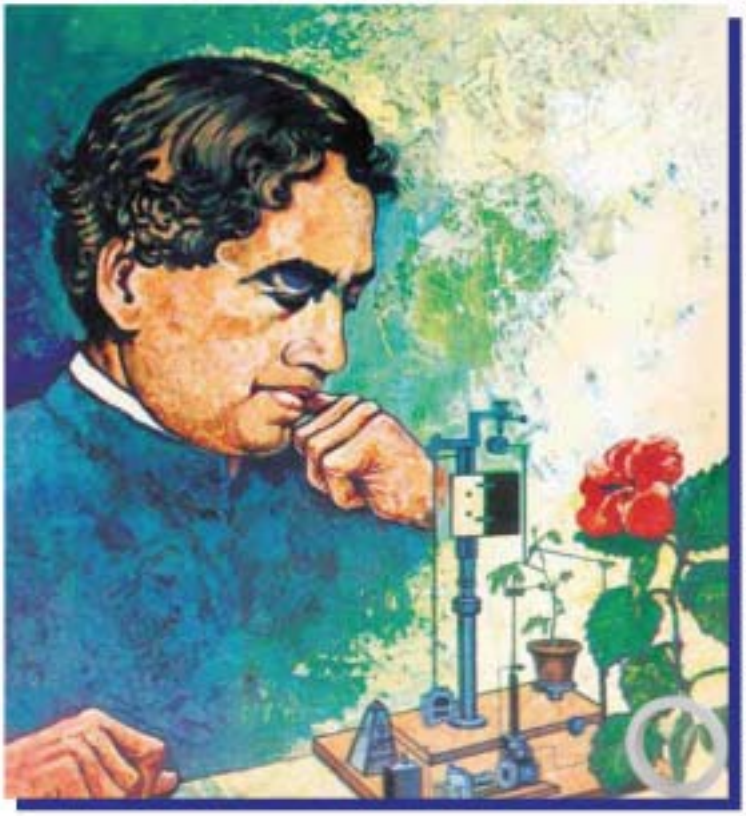

পৃথিবীর বিস্ময়
বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো পথপ্রদর্শক এবং অনুপ্রেরণা হতে পারেন বিশ্ববিশ্রুত বাঙালি বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। বিজ্ঞানবিমুখতা দূর করে আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামেও তিনি হতে পারেন আজকের বাংলাদেশের সবচাইতে বড়ো বন্ধু। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙালির বিজয় ঘোষণা করেছিলেন তিনিই প্রথম। বাঙালি তথা পরাধীন ভারতবাসীর মনেও তিনিই জ্বালিয়েছিলেন বিজ্ঞান ও প্রগতির আলো।

উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে সমধিক পরিচিত জগদীশ চন্দ্র বসুর আরো কয়েকটি পরিচয়–তিনি আধুনিক প্রাণ-পদার্থবিদ্যা (বায়ো-ফিজিক্স) এবং উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ব বিদ্যার জনক, বেতার যোগাযোগের অগ্রগণ্য সেমিকন্ডাক্টর, ডায়োড ডিটেক্টরের অন্যতম আবিষ্কারক। তাঁর হাতেই তথ্যপ্রযুক্তির মূল হাতিয়ার সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রথম প্রচলিত হয়। সাম্প্রতিককালে জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞান ইতিহাসের সেইসব বিরল বিজ্ঞানীর কাতারে সমাদৃত হচ্ছেন যারা বিজ্ঞানের একাধিক শাখায়; তত্ত্ব-প্রয়োগে, প্রযুক্তি- উদ্ভাবনে এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে সৃজনশীল ভূমিকা রেখেছেন।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর মৌলিক আবিষ্কারের বিশ্ব স্বীকৃতি হিসেবে 'ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স' (IEEE) নামক ইঞ্জিনিয়ারদের বিশ্ব সংগঠন ২০১২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মাইলফলক বসিয়েছে। IEEE-র সভাপতি পিটার স্টেকারের উপস্থিতিতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর নামের ফলকটি বসানো হয় তাঁর বিজ্ঞানসাধনার সূচনাস্থল 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়)-এ।

আচার্য বসুর বেতার তরঙ্গ আবিষ্কারের যে সংবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের অস্বীকৃতির বেড়াজালে ঢাকা পড়েছিল, সেই কৃত্রিম আধিপত্য চূর্ণ করে আচার্যের প্রাপ্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি হলো এই মাইলফলক। এতে লেখা আছে– IEEE MILESTONE IN ELECTRICAL AND COMPUTING, তারপর আরো লেখা হলো First Millimeter-wave Communication Experiments by J. C. Bose, 1894-1896, অর্থাৎ ১৮৯৪-১৮৯৬ সালে জে. সি. বসু কর্তৃক প্রথম মিলিমিটার তরঙ্গের পরীক্ষা। এরপর আচার্যের আবিষ্কারের বর্ণনা– Sir Jagadish Chandra Bose, in 1895, first demonstrated at Presidency

College, Calcutta, India, transmission and reception of electromagnetic waves at 60 GHz, over a distance of 23 meters, through two intervening walls by remotely ringing a bell and denating gunpowder. For his communication system Bose developed entire millimeter wave components, such as: a spark transmitter, coherer, dielectric lens, Polarizer, hoantenna and cylindrical diffraction grating.// September 2012//IEEE –এশিয়ায় জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়ার পর এ ধরনের ফলক বসানো এই প্রথম।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ, বাঙালি জাতির গৌরব ও কালজয়ী বিজ্ঞানী, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) ছিলেন বিশ্ববরেণ্য পদার্থবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালে তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিজ্ঞান মন্দির', ভারতের প্রথম বিজ্ঞান গবেষণাগার। কালক্রমে এ প্রতিষ্ঠান শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান বিজ্ঞান গবেষণাগারে পরিণত হয়। তিনি বাংলা ভাষায় ছোটোদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৬ সালে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিটিও তাঁর লেখা, যা স্থান পেয়েছে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে। গ্রন্থটি তিনি লিখেছেন মূলত ছোটোদের জন্য। গ্রন্থটির বাকি সব প্রবন্ধই বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লেখা।

বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলার বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার 'নাইটহুড' সম্মাননায় ভূষিত করেন। ১৯২০ সালে ব্রিটেনের বিখ্যাত বিজ্ঞান সমিতি 'রয়েল সোসাইটি'র ফেলো মনোনীত হন। এরপর তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞান সমিতি 'সোসাইটি ডি ফিজিক'-এর সদস্য মনোনীত হন। ১৯২৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৪তম অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৮ সালে তিনি মনোনীত হন 'ভিয়েনা একাডেমি অফ সায়েন্স'-এর সদস্য। ১৯২৯ সালে তাঁকে 'ফিনিস একাডেমি অফ সায়েন্সেস অ্যান্ড লেটার্স'-এর সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। লিগ অব নেশন্স গঠিত হলে, 'লিগ অব নেশন্স কমিটি ফর ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন' কমিটিতেও সদস্য মনোনীত হন জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইন্ডিয়া'-এর প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।

জীবন ও শিক্ষা

জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। জন্মের সময় তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। ইংরেজি স্কুলে না দিয়ে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করান। ফরিদপুর জেলার এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই শিশু জগদীশের মনে বাংলার লোকাভিনয়, যাত্রাপালাগান, রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি ও চরিত্র সম্পর্কে গভীর আগ্রহ জাগে। স্কুলে সমাজের ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু সকল শ্রেণির মানুষের সন্তান একই সাথে শিক্ষা গ্রহণ করত। তাদের সাথে অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলে জগদীশচন্দ্রের মনে বাংলার লোকজীবন, সংস্কৃতি ও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। এই দেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ জগদীশ চন্দ্র বসু আজীবন অন্তরে লালন করেন।

জগদীশ চন্দ্র বসুর এগারো বছর বয়সে তাদের পরিবার কলকাতায় চলে যান। সেখানে তিনি ১৮৭৫ সালে হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৮৭৭ ও ১৮৮০ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে যথাক্রমে বিজ্ঞান বিভাগে এফএ ও স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময়েই তিনি রেভারেন্ড ফাদার লাফোঁ'র উৎসাহে পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হন। বন্ধু রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতা, ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আর্থিক সহায়তা এবং ফাদার লাফোঁর কার্যকর সহায়তা ও উৎসাহে তাঁকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এখান থেকে ট্রাইপস (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যায়) পাশ করেন এবং প্রায় একই সাথে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাঠ সম্পন্ন করেন। বিদেশে অধ্যয়ন শেষে তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৮৮৫ সালে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অস্থায়ী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তাঁর গবেষণার সূত্রপাতও এখান থেকেই। এই কলেজকেই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহের সূতিকাগার হিসেবে আখ্যায়িত করা

হয়। এরপর স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা যেমন সারা বিশ্বকে নতুন নতুন তত্ত্ব ও সম্ভাবনায় চমকিত করেছে, তেমনই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতেও সাহায্য করেছে। ১৯৩৭ সালে ২৩ নভেম্বর বরেণ্য বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবনাবসান ঘটে।

বিজ্ঞানী ও গবেষক জগদীশ চন্দ্র

বাঙালি বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুই প্রথম প্রমাণ করেন উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে গাছেরাও সাড়া দেয়। উদ্ভিদের প্রাণ থাকা সম্পর্কে যদিও প্রাচীনকাল থেকেই পন্ডিতেরা নিঃসংশয় ছিলেন, তবুও এর সপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তাঁদের হাতে ছিল না। এ কাজে এগিয়ে এলেন জগদীশ চন্দ্র বসু নিজেই, তিনি পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন– উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের মধ্যে বিপুল সাদৃশ্য রয়েছে; এক কথায় উদ্ভিদজীবন প্রাণীজীবনের ছায়া মাত্র। এরপর তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেন আর উদ্ভিদ ও তড়িৎ চৌম্বক ছিল তাঁর গবেষণার অন্যতম আরেকটি ক্ষেত্র। তিনি মার্কনীর আগেই রেডিও আবিষ্কার করেন বলে জনশ্রুতি আছে, তবে জগদীশ চন্দ্র কাজ করেন অতিক্ষুদ্র তথা মাইক্রো বেতার তরঙ্গ নিয়ে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং তার ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা প্রেরণে সফলও হন। যার প্রয়োগ ঘটেছে আধুনিক রাডার, টেলিভিশন, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী সব আবিষ্কারে এই মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মোবাইল টেলিফোনের মাধ্যমে আধুনিক পৃথিবীর যেগোযোগ ব্যবস্থার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তার প্রযুক্তিগত ভিত্তিও এই মাইক্রোওয়েভের কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল।

বিজ্ঞান ও গবেষণায় স্যার জগদীশচন্দ্রের মতো বাঙালিরা গ্যালিলিও-নিউটন-আইনস্টাইনের সমকক্ষ। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাই নিজেই তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৯২৭ সালে লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন–'জগদীশ চন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে কোনোটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।'

অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার চাকুরিতে জগদীশচন্দ্রের বেতন নির্ধারণ করা হয় ইউরোপীয় অধ্যাপকদের বেতনের অর্ধেক। এই বৈষম্যের প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। ইউরোপীয় শিক্ষকদের অনেকেই মনে করতেন ভারতীয়রা বিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং গবেষণা কাজের উপযুক্ত নয়। জগদীশ তাদের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করেন। দীর্ঘকাল তিনি বেতন না নিয়েই শিক্ষকতা করে যান এবং অনেক ইংরেজ অধ্যাপকদের থেকে অধিক দক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হন। এতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় নতি স্বীকারে। তাঁর তিন বছরের বকেয়া মাইনে পরিশোধ করে

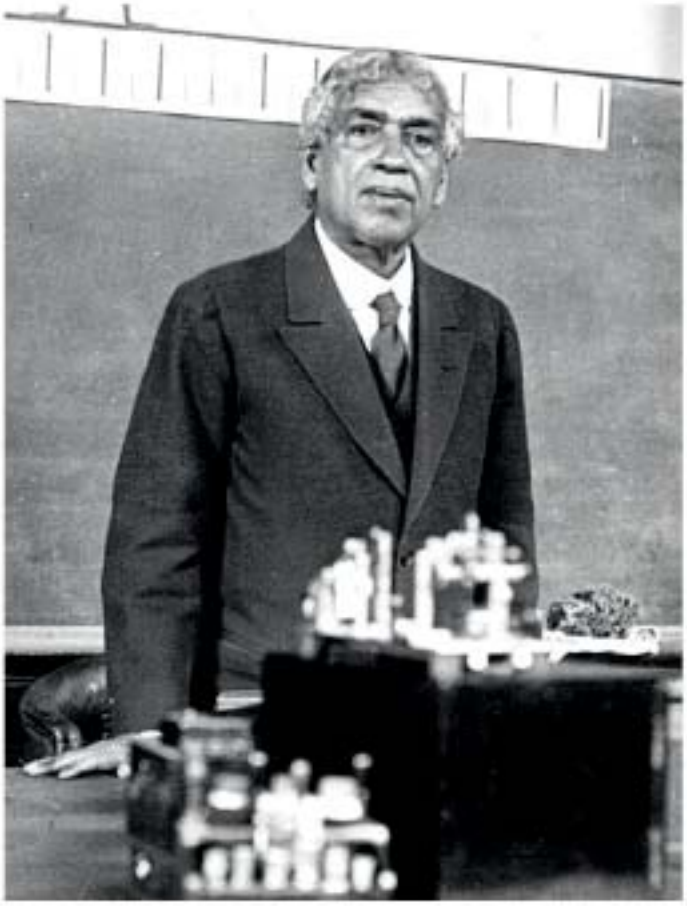

দেওয়া হয় এবং চাকরি স্থায়ী হয়। তখন থেকেই ইউরোপীয় ও ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতনের বৈষম্য দূরীভূত হয়। এখানে তাঁর হাতেই গড়ে ওঠে একদল কৃতী শিক্ষার্থী, যাদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

কলেজ প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের বৈষম্যমূলক ও বিজ্ঞান গবেষণা-বিরোধী আচরণ মোকাবিলা করে স্ত্রীর গহনা বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং রবীন্দ্রনাথসহ বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সাহায্যে তিনি প্রেসিডেন্সির বারান্দায় নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র-সমৃদ্ধ যে গবেষণাগার গড়ে তোলেন, সেখানেই তিনি টেলিযোগাযোগ বিষয়ে তদানীন্তন পৃথিবীর অগ্রসরতম গবেষণা পরিচালনা করেন (১৮৯৪-১৮৯৯)।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসে জগদীশ যে সকল গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন তা লন্ডনের রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণা পত্রগুলোর সূত্র ধরেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে। তাঁর এই গবেষণা কর্মগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করেই ইংল্যান্ডের লিভারপুলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। এরপর তিনি রয়েল ইনস্টিটিউশন, ফ্রান্স এবং জার্মানির বহু স্থান থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পান।

লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে তার বক্তৃতার বিষয় ছিল অন ইলেকট্রিক ওয়েভস। তাঁর বক্তৃতা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমৎকৃত ও আশ্চর্যান্বিত করে। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বক্তৃতা শোনার পর জগদীশের স্ত্রী অবলা বসুকে স্বামীর সফলতার জন্য অভিবাদন জানান। এ বিষয়ের ওপর বিখ্যাত সাময়িকী টাইম্‌স-এ একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, এ বছর ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মিলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, কেমব্রিজের এম.এ. এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স এই বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ রশ্মির সমাবর্তন সম্পর্কে যে মৌলিক গবেষণা করেছেন, তার প্রতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানী মহলে আগ্রহ জন্মেছে। রয়্যাল সোসাইটি বিদ্যুৎ রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়ের গবেষণাপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে সান্ধ্য বক্তৃতা

লিভারপুলে বক্তৃতার পর তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রাইডে ইভনিং ডিসকোর্স সান্ধ্য বক্তৃতা দেওয়ার নিমন্ত্রণ পান। বিশ্বের প্রথম সারির আবিষ্কারক হিসেবে এ আমন্ত্রণ জগদীশচন্দ্রের জন্য ছিল এক দুর্লভ সম্মাননা। ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি ১৯ তারিখে প্রদত্ত এই বক্তৃতার বিষয় ছিল 'অন দ্য পোলারাইজেশন অব ইলেকট্রিক রেইস' তথা বিদ্যুৎরশ্মির সমাবর্তন। বায়ুতে উপস্থিত বেশ কিছু বিরল গ্যাসের আবিষ্কারক হিসেবে খ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে তাঁর বক্তৃতা শুনে এবং পরীক্ষাগুলোর ফলাফল দেখে এতোটাই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তার কাছে সবকিছু অলৌকিক মনে হয়েছিল। তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেন, এমন নির্ভুল পরীক্ষা এর আগে কখনও দেখিনি–এ যেন মায়াজাল। এই বক্তৃতার সূত্র ধরেই বিজ্ঞানী জেমস ডিউয়ার-এর সাথে জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। ডিউয়ার গ্যাসের তরলীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত।

জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৯৪ সালের দিকে ব্যাপকভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যুৎ তরঙ্গের আলোকধর্মী প্রবণতার মধ্যে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, সর্বমোট প্রতিফলন, সমবর্তী বিচ্ছুরণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গবেষণা পরিচালনা করেন। আকাশ তরঙ্গ ও বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি বেতার বার্তার সূত্র আবিষ্কার করেন। বিনা তারে শব্দ প্রেরণের ক্রিস্ট্যাল রিসিভার নামক যে বেতার যন্ত্রটি তিনি আবিষ্কার করেন তার সাহায্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে সাংকেতিক শব্দ প্রেরণ করতে সক্ষম হন। এছাড়া তিনি নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, অদৃশ্য-আলোকেও দৃশ্য-আলোকের সকল ধর্ম বর্তমান। তাঁর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল বিশ্বের প্রধান বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে *দি ইলেক্ট্রিশিয়ান*, *প্রসিডিংস অব দ্য রয়েল সোসাইটি*, *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* এবং *দ্য ফিলোসফিক্যাল* ম্যাগাজিনের মতো বিখ্যাত সাময়িকী ও জার্নালগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল গবেষণা কর্মের ওপর ভিত্তি করেই ১৮৯৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এস-সি. ডিগ্রি প্রদান করে।

ক্ষুদ্র শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা থেকে আধুনিক তরঙ্গ পথের ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাঁর পরিচালিত গবেষণা, সৃষ্ট ও আবিষ্কৃত যন্ত্র সমূহের সঙ্গে রাডার প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ের যন্ত্র সমূহের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সময়ব্যাপী জগদীশ চন্দ্র বসু জীব ও জড়ের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ গ্রহণকারী বা কোহেরাস (Coherers)-এর কার্যকারিতা কমে যাওয়া আবার কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কার্যকর হওয়া সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর গভীর পর্যবেক্ষণ তাঁকে নতুন করে এ ক্ষেত্রটি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। ওয়ালার-এর তত্ত্বের প্রতিবিধান অনুসারে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার সামর্থ্যকে প্রাণশক্তি উন্মেষের বিশ্বজনীন চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত করা যেতে পারে। বসু পরীক্ষার মাধ্যমে প্রদর্শন করেন যে, জীব ও জড় বস্তুর মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ তাদের আণবিক গঠনে একইরূপ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ ধরনের কিছু ধারাবাহিক গবেষণায় তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে প্রাণী দেহ এবং শাকসবজির কোষকলাসমূহ বৈদ্যুতিক ক্রিয়া দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় ও সাড়া দেয়। এছাড়া তাপ, ওষুধ, রাসায়নিক দ্রব্য এবং যান্ত্রিক চাপেও একইভাবে এরা উদ্দীপ্ত হয়। তিনি আরো দেখিয়েছিলেন, একইভাবে নির্ধারিত কিছু অজৈব পদার্থেও এর সমরূপ উদ্দীপনা ঘটানো যেতে পারে। তাঁর এই গবেষণাকর্ম বিখ্যাত বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। প্রসিডিংস অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি সাময়িকীটিতে জীব ও জড়ের সাড়া দেওয়ার শক্তি (Response in the Living and Non-living) শিরোনামে তাঁর এ সংক্রান্ত সকল লেখা সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ব এবং প্রাণ-পদার্থবিদ্যার জনক

উদ্ভিদ জগতের সংবেদনশীলতা বিষয়ক গবেষণার পর জগদীশ চন্দ্র আত্মনিয়োগ করেন প্রাণ-পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায়। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তিনিই প্রথম নতুন এই দুটি বিষয়ের সংযোজন ঘটান। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পদার্থবিদ্যা সুলভ গভীর দৃষ্টি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দক্ষতার কার্যকর প্রয়োগ ঘটান। তিনি কিছুসংখ্যক অজৈব পদার্থের মডেল (বাস্তব কণার নমুনা) তৈরি করেন, যা প্রাণী ও উদ্ভিদের কোষকলার মতো নির্ধারিত উদ্দীপকের প্রতি একই রকম সাড়া দান করে।

জগদীশ চন্দ্র বসু ১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি এমিরিটাস প্রফেসর পদ লাভ করেন। ১৯১৭ সালে উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে এখানে উদ্ভিদ ও কৃষি রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য উল্লিখিত বিভাগসমূহ খোলা হয়। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু আমৃত্যু এখানে গবেষণাকার্জ পরিচালনা করেন।

জগদীশ চন্দ্র ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানকার বিদগ্ধ বিজ্ঞানীদের নিকট তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল তুলে ধরেন। এসময়ে কিছুকাল (১৯০০-১৯০২) তিনি লন্ডনের বিখ্যাত রয়্যাল ইনস্টিটিউটে কর্মরত ছিলেন। ১৯১৬ সালে জগদীশ চন্দ্র বসু 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২০ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটি অব লন্ডনে ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯২৮ সালে ভিয়েনা একাডেমি অব সায়েন্স-এর করেসপন্ডিং সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিজ্ঞান সমিতির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ভারতের

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু-এর পৈত্রিক নিবাস, বিক্রমপুরের রাঢ়ীখাল

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

জগদীশ চন্দ্র বসু কাজ করেছিলেন মাইক্রোওয়েভ নিয়ে। এই মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয় মূলত টেলিভিশন ও রাডারে। এ কারণেই পরবর্তীতে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী নেভিল মট মন্তব্য করেন, 'জে. সি. বোস (জগদীশ চন্দ্র বসু) তাঁর সময়ের চেয়ে অন্তত ৬০ বছর এগিয়ে ছিলেন।'

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর লেখনি

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন একজন বিশুদ্ধ গবেষক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি ছিলেন সুবক্তা ও সুলেখক। তাঁর লেখনী আজো আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে উৎসাহ যোগায়। তিনি ১৯১৮ সালে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে বলেন,'অতীতের ত্রুটি সম্পূর্ণ মুছিয়া না ফেলিলে কোনো নতুন প্রচেষ্টা একেবারেই অসম্ভব।' শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন- পৃথিবীর বহুদেশে ভ্রমণ করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমাদের সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষা কেবল মনুষ্যত্বলাভের উদ্দেশ্যে মাত্র। কী করিয়া আমরা দুর্বলের ক্রন্দন ও ... মান অভিমান ও আবদার ত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তিবলে স্বহস্তে স্বীয় অদৃষ্ট গঠন করিতে পারি, তাহাই যেন আমাদের একমাত্র সাধনা হয়। জীবনসংগ্রাম প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন– আমার জীবনে যদি কোনো সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন, তাহা সর্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে; যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখ।(জীবনসংগ্রাম, বোধন, অব্যক্ত)

মেকি অহমিকা সম্পর্কে রীতিমতো খড়্গহস্ত ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, তাই তো তিনি লিখেছেন– আমাদের দেশে অল্পতেই লোকের মান ক্ষয় হয়। আমাদের দেশের ছাত্র, যাহারা আমেরিকা যাইয়া সেখানকার রীতি অনুসারে কোনো কার্যহীন জ্ঞান করে নাই; এমন কি, দারোয়ানী করিয়া এবং বাসন ধুইয়া বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছে, এখানে আসিয়াই তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়া বিদেশির বাহ্য ধরন-ধারণ অবলম্বন করে। তখন তাঁহাদের পক্ষে অনেক কার্য্য অপমানকর মনে হয়। (শিল্পোদ্ধার, বোধন, অব্যক্ত)

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু মনে করতেন ধৈর্য এবং সহানুভূতিই মানুষের মোক্ষলাভের উপায়, তাঁর মতে– কেবল সহানুভূতি-শক্তিতেই আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয় (আহত উদ্ভিদ, অব্যক্ত)। অপরপক্ষে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আশাবাদী একজন মানুষ। তাঁর মতে, দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন (মানসিক শক্তির বিকাশ, বোধন, অব্যক্ত)। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতি লাভ করিবার লালসায় তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী স্বরস্বতীর যে শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।'

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক, গণমুখী চরিত্রের যুক্তিবাদী মানুষ। অপরিমেয় জীবনবোধ ও শক্তিমত্তা ছিল তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি অবলীলায় শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের রাজ্যে সমভাবে বিচরণ করতেন। তাই তো তাঁর সম্পর্কে সমালোচকও লিখতে বাধ্য হন, '... লেখক কবিতার ভাষায়, গানের ঝংকারে, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব গল্পের মতো বর্ণনা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এক ঈর্ষণীয় সম্মিলন তাঁর মাঝে ঘটেছিল। বৃটিশ সম্পাদকের লেখনীতেও তাঁর উদ্দেশে উৎকীর্ণ হয় শ্রদ্ধার্ঘ্য, 'In Sir Jagodish the culture of 30 countries has blossomed into a scientific brain of an order which we cannot duplicate in the West.'

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু যেহেতু বিজ্ঞানচর্চাকে সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতেন, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো এমন কাজ করা যাতে আমাদের সমাজ ক্রমান্বয়ে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানমুখী হয়ে ওঠে। এজন্য স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞানের উদ্ভাবনামূলক বিষয়ের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি পাড়ায়-মহল্লায় বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলে গণভিত্তিক ও ব্যাপক বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমাজের সকলকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

গাছ বন্ধুদের উপহার

জয়িতা পাল সিঁথি

দুই বোন মেধা ও মীম। মেধা গল্প লিখে আর মীম ছবি আঁকে। তাদের লেখা ও ছবি নবারুণ-এ ছাপা হয়েছে। নবারুণ পত্রিকা শিশুদের জন্য 'নবারুণ আড্ডা' নামের একটি অনুষ্ঠান করেছিল। সেখানে 'নবারুণ' পত্রিকায় যাদের লেখা ও ছবি ছাপা হয়েছিল সেসব শিশু সেখানে উপস্থিত ছিল। মেধা ও মীমের লেখা ও ছবি ছাপা হয়েছিল। তারাও 'নবারুণ' থেকে সেই অনুষ্ঠানে দাওয়াত পায়। তাই তারা সেখানে উপস্থিত ছিল।

সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনেক মজার জিনিস নিয়ে কথা হয়। নাচ, গান হয়। এরপর অনুষ্ঠান শেষে 'নবারুণ' থেকে সবাইকে দুপুরের খাবার এবং গাছের চারা উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। মেধা ও মীম বাসায় এসে তাদের বারান্দায় খোলামেলা আলো-বাতাসের মধ্যে গাছ দুটোকে লাগায়। সেই গাছ দুটোর সাথে আরো কয়েকটি গাছ ছিল। দুই বোন মিলে সেই গাছগুলোতে প্রতিদিন পানি, শুকনো চা পাতা, সার এসব দিয়েছে। এরকম করে তিন-চার মাস হয়ে গেছে। গাছগুলো অনেকখানি বড়ো হয়ে গেছে। গাছ দুটো একদিন নিজেদের মতো কথা বলছে। মেধার গাছটি বলছে, 'দেখ এই দুই বোন আমাদেরকে এত যত্ন করে। প্রতিদিন আমাদের পানি দেয়, চা পাতা দেয়। দরকার হলে সার দেয়। তাই আমাদের উচিত ওদেরকে একটা উপহার দেওয়া।' মীমের গাছটি বলল,' কী উপহার?' অপর গাছটি বলল,'আমরা তাদেরকে ফুল উপহার দিবো।' অন্যদিকে আরেকটি গাছ বলল,'হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও দেবো। কারণ আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। তারা দুই বোন আমাকেও তোমাদের মতো অনেক যত্ন করে। তাই আমারো তাদেরকে উপহার দেওয়া উচিত।' এটা শুনে মেধার গাছটি বলে উঠল, 'ঠিক আছে। তাহলে আমরা কাল সকালে তাদের ফুল উপহার দিবো।'

সকালবেলা মীম গাছে পানি দিতে এসেই চিৎকার করে উঠল, 'আপু আপু দেখে যাও। তিনটি গাছে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে।' মীমের চিৎকার শুনে মা-বাবা বারান্দায় এলেন। মা বললেন, 'তাই তো। কী সুন্দর লাগছে ফুল গাছগুলোকে!' এদিকে ফুল দেখে মেধা তার পছন্দের কাজ ফটোগ্রাফি শুরু করে দিয়েছে। তাদের আনন্দ দেখে ফুল গাছগুলোও মাথা দুলিয়ে সেই আনন্দে যোগ দিল।

৭ম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বসুন্ধরা শাখা, ঢাকা।

পরিবেশবান্ধব উপহার

সাদিয়া তাসনিম মোহনা

জীবনে আমি অনেক উপহার পেয়েছি, জন্মদিনেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার পেয়ে থাকি। খেলনা, পোশাক, টাকা, সোপিস নানা ধরনের উপহার। আর উপহার পেলে খুব ভালো লাগে, সেগুলো অনেক যত্ন করে রাখি। কিন্তু ২৮ শে অক্টোবর ২০১৬ তারিখে আমি পেলাম এক ভিন্নরকম উপহার। এদিন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজন করে 'নবারুণ আড্ডা' অনুষ্ঠানের। ঐ অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোর পত্রিকা নবারুণের খুদে লেখক ও আঁকিয়েদের সনদ ও উপহার দেওয়া হয়। ঐ উপহারটি ছিল গাছের চারা। ভিন্নরকম উপহার পেয়ে সেদিন আমার মন খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বার বার ভাবছিলাম কীভাবে, কোথায় এটি লাগাবো। পরে ঠিক হলো বারান্দার টবে লাগাবো। আম্মু আমাকে টব ও মাটি এনে দিল। আমি আর আম্মু খুব যত্ন করে গাছটি লাগালাম। আমার উপহারটি ছিল জবা ফুলের চারাগাছ। আগ্রহ করে তার যত্ন নিই। নতুন পাতাও গজালো বেশ। কিন্তু ফুল আর হয় না। পরে আম্মু বলল, ওকে বাইরে লাগাতে হবে। নাহলে ফুল হবে না। সত্যিই একদিন আম্মু ওকে বাসার পাশের খালি জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে আসল। আমার সেদিন খারাপ লেগেছিল। তারপর থেকে ও বাইরে বড়ো হতে লাগল। একদিন দেখি কে যেন ওর অনেক পাতা ছিঁড়ে ফেলেছে। খুব কষ্ট পেয়েছিল। এখন ও শীর্ণকায় হয়ে গেছে। তবে এই গাছের চারা লাগানোর পর থেকে আমার গাছের প্রতি মায়া সৃষ্টি হয়েছে। গাছ লাগানোর আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আম্মু একবার পাহাড়ি আম কিনে এনেছিল। আমি সেই আমের বীজ মাটিতে লাগিয়ে দিলাম ৭টি চারা গজিয়েছে। ঐ চারাগুলো আমি আমাদের কলোনিতে লাগাবো। আর কয়েকটা অন্যকে উপহার দেবো। পরিবেশ সুস্থ রাখতে আমি অনেক গাছ লাগাবো।

পঞ্চম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

আমাদের যত ঋণ

আমিরুল হক

বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতার রেশ
হলদে মাঠের ঘাস
কেমন করে ফেলব আমরা
স্বস্তির নিশ্বাস।
অনাবৃষ্টি ও ঝড়-ঝঞ্ঝার
এরই বা কী কারণ
বৃক্ষ কেটে করছে ফাঁকা
শুনছে না কেউ বারণ।
আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাড়ছে
দুর্যোগ দুর্গতি
মানবসৃষ্ট হাজার কারণে
হচ্ছে এমন ক্ষতি।
বাঁচার জন্য সচেতনতা
খুব বেশি প্রয়োজন
বৃক্ষরোপণে বাড়াতে হবে
সবুজাভ বনায়ন।
নির্মল বায়ু দেবে আরো আয়ু
বাঁচব দীর্ঘদিন
প্রকৃতির কাছে থাকবে তো জমা
আমাদের যত ঋণ।

সজল ও সবুজের গল্প

সৈয়দা নাজমুন নাহার

কমলাপুরের ঠাকুর পাড়ার শেষ মাথায় নতুন একটি বাড়ি হয়েছে সাদা রঙের। সামনে বাগান, নানা দেশি বিদেশি গাছের রংবাহারি ফুল। সবুজের আস্তরনের ভেতর সাদা বাড়িটি যেন শ্বেত বলাকা কিংবা গর্বিতা রাজহংসী।

বাড়ি তৈরি শেষ। সবকিছু সাজানো গোছানো। কিন্তু এখনো কেউ আসেনি বাস করতে। চাকর-মালিরাই দেখাশুনা করে।

এই বাড়িটির উলটো দিকে একটি প্রাচীন বাড়ি। প্রাচীন বাড়ি বললাম এই জন্য যে, পুরানো আমলের চৌচালা ঘর। মোটা গজারির খুঁটি, টিনের চাল, ঘরটি দোতলা। আম, জাম, লিচু, কদবেল, কাঁঠাল, কী নেই বাড়িটিতে, এমন কী বাঁশঝাড় পর্যন্ত। সবচাইতে আকর্ষণীয় হলো কুল, পেয়ারার পাশেই কামরাঙ্গা গাছটি। চমৎকার গাছটিতে সবুজ কামরাঙা পেঁকে কখনো হলুদ বর্ণ হয়, আর ঝাঁক ঝাঁক সবুজ বুনো টিয়ে আসে দল বেঁধে।

এ বাড়ির বড়ো ছেলে সজল। বয়স বারো কি তেরো। বাবা, কাকা, দাদা, দাদি নিয়ে তাদের যৌথ পরিবার। সজলের বাবা পোস্টমাস্টার আর সজলের বড়ো চাচা ব্যাংকে চাকরি করেন। ছোটো চাচা মেডিকেলে পড়ে। বেশির ভাগ সময় হলে থাকে। তবে ছুটির দিনে অবশ্যই বাসায় আসে। তখন খুব মজা হয়। ছোটো চাচা পুরানো ঢাকার বাখরখানি, মিষ্টি নিয়ে আসেন প্রতিবার। মা এই দিনে অভাবের সংসারেও বাড়তি খরচ করেন। নাস্তায় আসে আলু চচ্চড়ির সাথে সুজির হালুয়া, দুপুরে মুরগি- ভাত কখনো পোলাও, নতুন গুড়ের পায়েস। মিনা ফুফুরা এলে আয়োজন বেড়ে যায় আরো।

সজলরা চার ভাইবোন। বড়ো চাচার দুই ছেলে-মেয়ে। যৌথ পরিবারের বিরাট আয়ের অংশ চলে যায় ওদের লেখাপড়ার পেছনে। সজলের মায়ের কোনো সঞ্চয় নেই, কিন্তু বড়ো চাচির আছে। ব্যাংকার চাচা হিসেবি মানুষ। সংসারে টাকা দেওয়ার পরও আলাদা করে কিছু টাকা রেখে দেন দুঃসময়ের কিংবা ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু সজলের বাবা উদার মানুষ। নিজের আয় রোজগার দিয়েই ভাইবোনদের লেখাপড়া বিয়ে-থা দেওয়া সবই করেন। তাতে সজলের মায়ের মুখের হাসি কখনো

ম্লান হয় না। খুবই অল্পে তুষ্ট মানুষ। জগৎসংসারে কারো বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই।

সজলের স্কুলে যাওয়ার জন্য একটি মাত্র শার্ট আর প্যান্ট। দু-দিনের বেশি পড়া যায় না। তাই মা রাতে কেচে দেন। ভোরে ইস্ত্রি করে দেন সেই শার্ট। সবাই মায়ের স্বভাব পেয়েছে। নামাজ পড়া, দাদুর সাথে কোরাআন পাঠ করা, এমনকি বাবা, কাকা ও দাদুর সাথে জুম্মার নামাজ আদায় করা। সবই পেয়েছে ওরা। ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, গাছে চড়া, পুকুরে সাঁতার কাটা সবই ঠিকঠাক চলে।

একদিন সকালে সাদা বাড়িটির সামনে মালপত্র বোঝাই ট্রাক এল, আর একটি মাইক্রোবাসে করে এল পরিবারটি। সবুজ আর তিন্নী, বাবা-মা আর রমিজা বুয়া। সবুজের মা আধুনিক মহিলা। টিভিতে গান করেন। বাবা বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করেন। প্রাচুর্যে ভরা। দামি দামি জিনিসপত্রে ভরে গেল সারা বাড়ি।

সজলরা কাঠের দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখল। সবুজের মা-বাবা বিকেলে বাগানে বসে চা-পান করে। তিন্নী দোলনায় দোল খায়। সবুজ বাগানে হেঁটে বেড়ায়। রোগাপটকা শরীর। তাদের কোনো প্রতিবেশী নেই। কখনো কখনো গাড়ি করে দূরে বেড়াতে যায়, নন্দন পার্ক কিংবা ফ্যান্টাসি কিংডমে। তখন খুব মজা হয়। সবুজ, তিন্নী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। টিভি দেখে, কম্পিউটার চালায়। সাদা বাড়ির বাইরে তাদের কোনো জগৎ নেই। বাবা চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। মা গান-বাজনা-ফাংশন নিয়ে সদাই ব্যস্ত। সন্তানদের অর্থ-বিত্ত-বৈভব ছাড়া কিছুই দেওয়ার নেই তাদের। প্রায়ই দামি খেলনা, নানা উপহার আর ফাস্টফুডের দামি খাবার নিয়ে আসে। তাদের এমন সব জামা কাপড় আছে যা একদিনও পড়া হয়নি।

এত কিছুর পরও সবুজের স্বাস্থ্য ভালো হয় না। সন্তানেরা দামি উপহার আর ভালো খাবার চায় না। চায় মায়ের মমতা আর বাবার আদর এবং বাবা-মায়ের সঙ্গ।

সবুজের পৃথিবীটা হঠাৎ করে সবুজ হয়ে যায় একদিন। সেদিন বাবা-মার সাথে মামার বাসা থেকে ফিরছিল। গলির মাথায় কাদাপানিতে গাড়ির চাকা দেবে গিয়েছিল, রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে আছে। সবুজের মা খুবই বিরক্ত। তখনই সজলরা কয়েক বন্ধু ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছিল, খুব আনন্দে ছিল ওরা কারণ চার গোলে জিতেছে ওদের দল। সবুজকে দেখে চিনে সজল। এগিয়ে যায় সজল। সবুজের বাবাকে সালাম দিয়ে বলে, আমি সজল, আপনাদের সামনের টিনের বাড়িটা আমাদের। আমরা ফুটবল খেলে ফিরছি, চার গোলে জিতেছি।

'খুব ভালো'।

চাচা আমরা সবাই মিলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি, ভাববেন না। সজল তার বন্ধুদের নিয়ে গাড়িটি ঠেলে সবুজদের বাড়ি অবধি নিয়ে যায়।

সবুজের বাবা-মা দুজনেই নেমে আসে, সবুজ, তিন্নীও সাথে আসে। সবুজের বাবা বলেন, এরা সোনার ছেলে, বুঝলে নাজমা। সবুজের মা বলেন, কাল ছুটি, তোমরা সবাই অবশ্যই বিকেলে আসবে। 'আসব' বলে সবাই একে একে বিদায় নেয়।

পরদিন অপরাহ্নে সবুজদের সবুজ বাগানটি উৎসবে ভরে উঠল। সজল এসেছে বাগানের ফল- আম, জাম, পেয়ারা, আতা নিয়ে। মন্টু এনেছে সুন্দর একটি তার আঁকা ছবি নিয়ে, সজীব তাদের বাগানের ফুল দিয়ে তোড়া বানিয়ে এনেছে। বিজয় নিজ হাতে কার্ড বানিয়ে এনেছে। সবাই কিছু না কিছু উপহার এনেছে সাথে করে। সবুজের মা সবাইকে গুড়ের সন্দেশ আর পাকোড়া ভেজে খাওয়ালেন। অনেক গল্প আর খেলাধুলা হলো। সবাই সবার বন্ধু হলো।

সজলের সাথে সবুজের ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। এখন সবুজ অনেক সুস্থ। সজলের মায়ের হাতের বেগুনভর্তা, কুমড়োর ফুলের বড়া, সজনে ডাঁটার ডাল দিয়ে তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে ভাত খায়।

বাসার দামি খাবারের চাইতেও লোভনীয়। কিংবা বিকেলে মুড়ির মোয়া, নারকেলের নাড়ুর স্বাদই আলাদা। এখানে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। পেয়ারা গাছে চড়ে, পেয়ারা খায়, কামরাঙা গাছের সবুজ টিয়ের সাথে ভাব হয়ে যায়। ক্ষুদে ফুটবল টিমের সেও একজন সেরা খেলোয়াড়। ছেলের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দেখে সবুজের বাবা-মাও নিশ্চিন্ত। তাদের দুই পরিবারের মধ্যে গড়ে ওঠে নিবিড় আত্মিক বন্ধন।

কারণ মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজ বিবর্জিত হয়ে কিংবা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো ভালো থাকতে পারে না। কারণ মানুষও যে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মেঘ গাছেরা

সাইদুস সাকলায়েন

প্রায় জলশূন্য এক নদী। তীরে ছোট্ট একটি ঘাস। আর এক পাখি। পরিত্যক্ত গ্রহের মতো ধূ ধূ প্রান্তরে ওরা তিনজন। ইচ্ছে করলেই পাখি উড়ে যেতে পারত দূর দিগন্তে। তবে ঘাস আর নদীকে ফেলে সে কোথাও যায় না।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন? গাছ নেই বলে ছায়া নেই। পাখির কোনো বাসা নেই। রৌদ্রের খরতাপে কষ্টও বাড়ছে। একটি মাত্র পাখি। সেও যদি মরে যায়? কথাটা মনে আসতেই নদীর বুক হাহাকার করে ওঠে। নদীর মনের অবস্থা বুঝতে পারে সূর্য। বলে, দক্ষিণ দিগন্তের দিকে একটি বন আছে। সাতদিনের পথ। পাখিকে ওখানেই পাঠাও। ওখানে সে ছায়া পাবে, খাবার পাবে, বন্ধু পাবে। অনেকের সাথে আনন্দে বাঁচতে পারবে।

সূর্যের কথায় নদী চিন্তিত হয়। পাখি চলে গেলে আর বাঁচব কী নিয়ে? শেষটুকুও হারানোর আশংকায় মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে নদী। পাখিকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। অনেক ভেবে সূর্যের কানে কানে কী যেন বলে। সূর্য বলে, ঠিক আছে। তোমার যেমন ইচ্ছে।

পরদিন। নদীর দু'ধার জুড়ে অজস্র গাছ! সাদা সাদা নীল নীল মেঘ গাছ! নদীর জলকে বাষ্প বানিয়েছে সূর্য। সেই বাষ্পে তৈরি হয়েছে মেঘ। আর ওই মেঘগুলো মেঘ গাছ হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে তীরে। নিজের জন্য এমন আয়োজন দেখে পাখি অবাক হয়। কিন্তু... নদী যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!

পাখি নদীকে বলে, না না। আমি মেঘ গাছ চাই না। আমার কেমন ভয় করছে। তোমার বুক জলশূন্য হয়ে পড়েছে। নদী বলে—ভয় পেও না, পাখি। গাছে গাছে উড়ে বেড়াও। গান গাও। মাটি থেকে খাবার খুঁটে খাও। আর তেষ্টা পেলে চঞ্চুভরে মেঘ গাছ থেকে জলপান করো।

রাতে অন্ধকার বাড়ার সাথে সাথে যেন আলোকসজ্জার রূপ নেয় মেঘ গাছেরা! ওদের ভেতর বিদ্যুৎ-চমকের মতো শাখাপ্রশাখা তৈরি হয়েছে। সেখানে মনের আনন্দে নাচছে আর গান গাইছে পাখি।

এরপর। দিনের আলো তখনো পুরোপুরি ফোটেনি। হঠাৎ কোত্থেকে বাতাসের ঝাপটা এসে পড়তে লাগল গাছেদের গায়ে...তছনছ হতে লাগল সব। ভয়ে আঁতকে ওঠে পাখি। নদী নির্বাক। বাতাসের ঝাপটায় নদীকে ফেলে যেতে যেতে কান্নায় ভেঙে পড়ে মেঘ গাছেরা। পাখি তখন বোবা হয়ে গেছে। এ কী ঘটে গেল আজ! ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাতেই বুকের ভেতর আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। নদীর আর জলধারা নেই। গতি নেই, স্পন্দন নেই। পড়ে আছে পোড় খাওয়া পাথরের মতো।

কেঁদে কেঁদে সারা হয় পাখি আর ঘাস। তখন সূর্য বলে, পাখি ওঠো। উড়ে যাও ওই দূর দক্ষিণের বনে। সেখানে শত শত গাছ তোমার অপেক্ষায় আছে। ওদেরকে নিয়ে এসো। তাহলেই নদী তার প্রাণ ফিরে পাবে। ঘাসকে রেখে অমনি উড়াল দেয় পাখি।

নদীর বেঁচে ওঠার আর পাখির ফিরে আসার স্বপ্ন দেখে ঘাস। এভাবে দিন কেটে যায় রাত আসে, রাত কেটে যায় দিন আসে। নদী জাগে না, পাখিও ফেরে না। দিনদিন নুইয়ে পড়ে ঘাসের শুকনো দেহ। একদিন হঠাৎ...এক অদ্ভুত শব্দে আকাশের দিকে ফিরে তাকায় ঘাস। একি! দৈত্যের মতো ডানা মেলে ওদিক থেকে কারা উড়ে আসছে?

আরে! ওই যে পাখি! পাখির সাথে সাথে উড়ে আসছে অনেক গুলো গাছ। পত্রপল্লবের ডানায় ভর দিয়ে ছুটে আসছে ওরা।

নদীর তীর ভরে যাচ্ছে গাছে। গাছের ফাঁকে একটু একটু করে জমে উঠছে মেঘ। টপটপ করে জল পড়ছে পাতা থেকে। জল পড়ছে ডাল আর কাণ্ড বেয়ে বেয়ে। নদীর তলদেশে রক্তনালীর মতো ঝর্ণার চটুল চলার সুর। পাখি তখন আনন্দে ছুটোছুটি করে। এ কূল থেকে ওই কূলে, এ গাছ থেকে ওই গাছে।

মুহূর্তেই নদী তার প্রাণ ফিরে পায়। চোখ মেলে তাকায়। তার দুইধার শ্যামলিমায় ভরা। এরপর...তরতর করে কী যেন দেখতে চায় নদী, দেখতে পায় না। কান পেতে কার কথা শুনতে চায় যেন, শুনতে পায় না। হঠাৎ মনে পড়ে... পাখি কোথায়? আর সেই ছোট্ট কচি ঘাস?

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে পাখি! পাতা নাড়ে তাজা কচি ঘাস! নদীর প্রাণ ফিরে পাওয়ায় আনন্দ-অশ্রু জমে ওদের চোখে। নদী তীরের গাছগুলো বলে, বেঁচে থাকো, চিরকাল বেঁচে থাকো নদী।

অন্যদিকে...নদীর স্বচ্ছ জলের আয়নায় মুখ দেখে আকাশের মেঘ গাছেরা।

গল্পে গরু গাছের ডালে

দুখু বাঙাল

বরিশালের ঠিক দখিনে আমার দাদার বাড়ি
পায়রা নদীর খানিক পুবে অনেক যে কাউফল
মিষ্টিঝরা ফলের মতো নামখানি বাউফল
রেললাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে শতেক শতেক গাড়ি।

আছে হাজার পাহাড় চূড়া খানিক মরুর পথ
সারাক্ষণই দেখতে পাবে ঝর্ণাধারার হাসি
টি-গার্ডেনের একটি ছেলে বাজায় কেবল বাঁশি
হঠাৎ করে দেখবে তুমি উটের আজব রথ।

বাসন ভরে দেব তোমায় দাদির হাতের গজা
সবাই মিলে যাচ্ছি বাড়ি রেলের টিকিট কেনা
আমি না হয় চালক হব পথ যে সবই চেনা
গল্পে গরু গাছের ডালে দেখবে কেমন মজা।

দীপার যত সুখ

রেবেকা ইসলাম

আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা
সাদা কালো ধূসর ভেলা
মনটা উন্মুখ
মেঘের অতুল রূপে কাঁপে বিশাল আকাশ বুক
ওই আকাশে ভেসে বেড়ায় দীপার যত সুখ।

সবুজ পাতার হিজলবনে
কাঠবেড়ালি কোণে কোণে
পাখির আসা-যাওয়া
সাঁঝের বেলা দোল দিয়ে যায় মিষ্টি মধুর হাওয়া
ওই বনেতে দোদুল দোলে দীপার যত চাওয়া।

হাজার নাওয়ের সুরের নদী
বইছে তালে নিরবধি
গভীর অতল খাদ
উচ্ছল মেয়ে এগিয়ে চলে ভেঙে সকল বাঁধ
ওই নদীতে ঢেউ খেলে যায় দীপার যত সাধ।

রাইসা রহমান, দ্বাদশ শ্রেণি, আইডিয়াল কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

গল্প

নদীর জন্য ভালোবাসা

জসীম আল ফাহিম

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে স্পর্শবাবু কিছু একটা ভাববে। ঠিক তখন একটি ছোট্ট টুনটুনি পাখি কোথা থেকে যেন উড়ে এসে পাশের বেলিফুল গাছের চিকন ডালে বসবে। তারপর পাখিটি 'টুন্ টুন্ টুইস টুইস' করে কিছুক্ষণ গান গেয়ে ওকে সকালের অভিবাদন জানিয়ে যাবে। তখন হাওয়ার দোলায় ভেসে আসবে বেলি ফুলের মন মাতানো ঘ্রাণ। একটি রঙিন প্রজাপতিও আনমনে বাতাসে ভেসে ভেসে একবারও মাথার ওপর দিয়ে ওড়ে যাবে। এভাবেই প্রতিদিন ওর সকালটা শুরু হয়ে থাকে। এটাই যেন নিয়ম।

কিন্তু আজ স্পর্শবাবুর মন ভালো নেই। টুনটুনি পাখি ওকে গান শোনাতে আসেনি। বেলিফুলের সুঘ্রাণে মন প্লাবিত হয়নি। প্রজাপতিটাও একবার আসেনি ঠিক আগের মতো ওকে ভালোবাসতে। কাজেই স্পর্শ বাবুর মন ভালো না থাকাটাই স্বাভাবিক।

জন্ম থেকেই স্পর্শবাবু কথা বলতে পারে না। এখন ওর বয়স সাত বছর। কথা বলতে না পারলে কী হবে? ও-সবকিছুই ভালো বুঝতে পারে। মন দিয়ে শোনে আর ইশারা-ইঙ্গিতে প্রয়োজন মতো সবকিছু ঠিক ঠিক বোঝাতেও পারে। সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। যখন হাঁটাচলা করতে শিখল, বাবা-মা ওকে বড়ো ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ওর মুখ থেকে ডাক্তাররা একটি কথাও বের করতে পারেননি।

একটু বেলা হওয়ার পর বাবার হাত ধরে বেড়াতে বের হয় স্পর্শ। হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে যায় সুরমা নদীর তীরে। নদীর দুই ধারে সাদা কাশবন, হোগলার বন। মাঝখানে জলবিহীন শুকনো নদী। ওসব দেখে স্পর্শবাবুর মন আরো খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু বাবাকে বোঝানোর কোনো ভাষাই তো তার নেই। সুরমা নদীর বুকে কেন জল নেই। কেন চর জেগেছে।

বাবা-মা ছাড়া স্পর্শবাবুর কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। ও তো বোবা। কথা বলতে পারে না। তাই কেউ যেচে ওর বন্ধু হতে চায় না। বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকেন ততক্ষণ বাবাই ওর বন্ধু। মায়ের কোনো কর্তৃত্বই তখন টেকে না। মা ওকে বাসা থেকে বের হতে দেন না। এটা নিয়েও মাঝেমধ্যে স্পর্শের মন খারাপ হয়। পাড়ার কত ছেলে একসঙ্গে বিকেলে বেড়ায়। খেলাধুলা করে। কিন্তু স্পর্শকে দোতলার ছাদে উঠে ওসব দেখে দেখেই কাটাতে হয়। খেলাধুলা করা হয়ে ওঠে না।

সেদিন বিকেলে মাকে কোনো কিছু না বলে একা একা বের হয়ে পড়ে স্পর্শবাবু। খুব দূরে নয়। বাসার পেছনে যে উঁচু টিলা, তাতেই গিয়ে চড়ে বসল। দূরে বিস্তীর্ণ সবুজ। ফাঁকে ফাঁকে বাড়িঘর। বড়ো রাস্তা ধরে যাচ্ছে অসংখ্য যানবাহন। সবই দেখা যাচ্ছে। ওসব দেখে নিমিষেই ওর মনটা জুড়িয়ে গেল।

তারপর উঠে দাঁড়াতেই কাছের ঝোপে কী যেন একটা রঙিন বস্তু ওর নজর কাড়ল। বস্তুটির কাছে গেল স্পর্শবাবু। দেখতে পেল গোল একটি পাথর। পাথরটি গাঢ় নীল। স্পর্শ এটিকে তুলে নিল তার হাতে। সহসা ওর যেন কী হলো। ব্যাপারটি সে আপন মনে অনুভব করল। কেমন যেন একটু নড়াচড়া করে উঠল হাতের পাথরটি।

তারপর সে শুনতে পেল, তুমিই প্রথম মানুষ যে আমাকে আদর করে হাতে নিলে। তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে চুমু খাও। তোমার মঙ্গল হবে।

পাথরটির কথা শুনে কেমন যেন ভয় ভয় লাগছিল স্পর্শবাবুর। বুকে ঢিব ঢিব ভয়ের ঘণ্টা বেজে ওঠল। কী করবে বুঝতে পারছিল না। চোখ-মুখ কেমন যেন নীলাভ হয়ে উঠল তার। এমন সময় পাথরটি ওর হাতে আবার নড়েচড়ে উঠল। স্পর্শ শুনতে পেল-ভয় পেয়ো না বাছা। আমি তোমার খুব ভালো বন্ধু। আমাকে তোমার সব দুঃখের কথা, ভয়ের কথা শোনাও। আমি তোমার মনকে প্রফুল্ল করে তুলব।

স্পর্শ তখন কেমন যেন একটু ভরসা পেল। সে চুমু খেল হাতের তালুতে রাখা পাথর খণ্ডটিকে। চুমু খেতেই হঠাৎ কেমন যেন ঝাঁকি দিয়ে ওঠল ওর সারা শরীর। টিলা থেকে সে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। হাত-পায়ের কোথাও কোথাও গেল একটু-আধটু ছড়ে। বাসায় ফিরে মায়ের অগ্নিমূর্তি দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল স্পর্শ। কান্নাভেজা কণ্ঠেই বলল, মামনি, আমায় ক্ষমা করে দাও। আর কোনোদিন বাসার বাইরে যাবো না। এবারের মতো আমায় ক্ষমা করে দাও।

মামনি তো অবাক! তিনি ভাবতেই পারছেন না যে স্পর্শ কথা বলছে। আবেগে-আহ্লাদে ছেলেকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। তারপর চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলেন তার মুখ।

সেই রাতে নীল পাথরটি স্পর্শকে কানে কানে বলল, কী বন্ধু, এবার শোনাও তোমার মনে আর কী কী দুঃখ আছে। আমি তোমার মনের সব অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দেবো। স্পর্শ তখন বলল, দেখো-না, টুনটুনি পাখি গান শোনাতে আসে না। বেলিফুল গন্ধ ছড়ায় না। প্রজাপতিটাও আগের মতো আর আসে না। ভালোও বাসে না।

স্পর্শের কথা শুনে নীল পাথরটি বলল, অপেক্ষা কর বন্ধু, অপেক্ষা কর। দেখো, আগামীকাল সকালে ওরা ঠিক ঠিক তোমার কাছে আসবে।

নীল পাথরটির কথা শুনে স্পর্শের মন ভালো হয়ে গেল। সেই রাতে ভালো ঘুমও হলো। চোখে নেমে এল যেন রাজ্যের ঘুম। সেই রাতে একটি স্বপ্নও দেখল স্পর্শ। জলে একদম কানায় কানায় ভরে গেছে সুরমা নদী। সাদা সাদা গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে সুরমার বুকে। পাল তুলে সারি বেঁধে নৌকা চলছে দূরদূরান্তে।

সকালে ঘুম থেকে জেগে স্পর্শ দেখল, নীল পাথরটি তার কথা রেখেছে। কিন্তু তবুও যেন ওর মন কেমন আনমনা হয়েই রইল। কারণ, সুরমা নদীর বুকে খাঁ খাঁ বালুচর। পাখি নেই একটিও। লোকজন হেঁটেই পেরিয়ে যায় নদী। ওসব ভেবে কিছুতেই মনকে স্থির রাখতে পারল না স্পর্শ। মন তার খারাপ হয়েই রইল। নীল পাথরটি তখন বলল, কী ব্যাপার বন্ধু, আবার দেখি তোমার মন বিষণ্ন। কী হয়েছে, আমাকে সব খুলে বলো। আমি তোমার মন ভালো করে দেই।

স্পর্শ বলল, দেখো-না, সুরমা নদীতে জল নেই। পাখি নেই। মাছ নেই। ধু-ধু বালুচর। রঙিন পাল তোলা নৌকা নেই। লোকজন পায়ে হেঁটে পার হয়ে যায়। একটা নদীর মৃত্যু কীভাবে হলো দেখেছ? তাই তো আমার মন খারাপ। মন ভীষণ ভীষণ খারাপ।

স্পর্শবাবুর কথা শুনে নীল পাথরটি বলল, তাই তো দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে বন্ধু। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে

আবার যখন বেড়াতে যাবে তখন আমাকে নদীর বুকে ছুড়ে দিও। দেখবে তোমার সব আশা পূরণ হয়ে গেছে।

অন্য একদিন স্পর্শবাবু বাবার সঙ্গে নদীর তীরে বেড়াতে বের হলো। তখন নীল পাথরটিকে ছুড়ে দিল সে নদীর বুকে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল হাজার হাজার পাখ-পাখালিতে ছেয়ে গেছে আকাশ। শো-শো শব্দে কোথা থেকে যেন প্লাবনের মতো পানির স্রোত এসে কানায় কানায় ভরে গেল সুরমা নদী। যেমনটি স্পর্শ স্বপ্নে দেখেছিল সেদিন। পাখির কিচিরমিচিরে মুখর হয়ে গেল নদীর আশপাশ। পাল তোলা নৌকা ছুটে চলল দূরদূরান্তে।

কিন্তু কীভাবে যে কী হলো তা কেউ বুঝল না। বুঝল শুধু স্পর্শবাবু। আর বুঝলে তোমরা। যারা গল্পটি পড়েছো।

নদীর কাব্য

স্বপন মোহাম্মদ কামাল

দূষণে দখলে ম্লান হয়ে গেছে নদী
যে নদী একদা বয়ে যেত নিরবধি-
আজ সে নদীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
শিল্প-বর্জে, বিষ্ঠায় ওঠে ভরে।

যে নদীর বুকে প্রবাহিত কলতানে
মুখরিত হতো মাঝিদের গানে গানে-
আজ সে নদীর করুণ কান্না শুনি
শীর্ণ দেহের বুকের পাঁজর গুনি।

যে নদীর ছিল বাহারি নৌকা লঞ্চ
পণ্যে মুখর ছিল বন্দর গঞ্জ-
আজ কেন মৃত সেই নদীটার প্রাণ?
কাদের স্বার্থে নদী দিলো বলিদান?

কোন পাষণ্ড চেপে ধরে টুটি তার
সেই পাষণ্ডকে ভেঙে করি চুরমার
নদ-নদী যারা দখলে দূষণ করে
প্রতিবাদ করি সকলে-বাইরে ঘরে।

নদী-সে তো এই প্রকৃতিরই গায় গান
দুই পাড়ে তার শস্য সোনালি ধান,
তার বুকে কতো মৎস্যজীবীর বাস
হাসি আর গান ছিল কতো উল্লাস।

নদী মরে গেলে ভয়ানক পরিণতি
কখনো পূরণ হবে না জেনো এ ক্ষতি
বুকের মমতা ঢেলে দিয়ে নদী-বুকে
নদী দূষণের কালো হাত দেই রুখে।

মশা ও মানুষের বৈঠক

আরিফুন নেছা সুখী

একটি বিশেষ ঘোষণা, একটি বিশেষ ঘোষণা... মশক রাজা চিরিম তার রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মশাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বক্তব্য প্রদান করবে। তাই মশাদের সবাইকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে বলা হলো। একটি বিশেষ ঘোষণা...

ঘোষণা শোনার পর মশক রাজা চিরিমের রাজসভায় সবাই উপস্থিত। রাজা চিরিম তার বক্তব্য শুরু করল- শোনো, তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব, আর তা হলো...

হঠাৎ ফোড়ন কাটে ছোট্ট ইকির- কী কথা, কী কথা...

ইকির মা চুপিচুপি বলল- চুপ করো ইকির। রাজামশাই কথা বলছে, চুপ করো...

-আহঃ ইকির মা, মেয়েকে সামলাও...

-আজ্ঞে রাজামশাই।

-শোনো তোমরা... বিশ্বের উন্নত দেশ থেকে আমরা কবেই বিতাড়িত হয়েছি। আজ এই ছোট্ট দেশ বাংলাদেশও উন্নতির পথে; কিন্তু প্রিয় মানুষগুলোর অসচেতনতা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। অবশ্য গাড়ির কালো ধোঁয়ায় আমার শ্বাসকষ্ট হয়। জানো তো আমার হাঁপানি আছে। সে যাই হোক, তাই আমি ভাবছি, আমাদের ব্লাড ব্যাংক থাকা দরকার। যেখানে আমরা ব্লাড মানে রক্ত সংগ্রহ করে রাখব। যেন বিপদের সময় না খেয়ে মরতে না হয়। তাই তোমরা সবাই ওভারটাইম কাজ করবে। কী বুঝতে পেরেছো?

-সবাই একসাথে কাজ করবে। কেউ নিহত হলে সাথে সাথে আরো মশা সেখানে প্রেরণ করবে। কারো কিছু বলার আছে? আর সংবাদ বাহক হিসেবে প্রধান সেনাপতি চিকু, পিকু, টিকু আর ঝিকুকে নির্বাচন করছি।

-সভা আজকের মতো মুলতবি ঘোষণা করছি।

রাজামশাই যেতে না যেতেই সভায় গুঞ্জন উঠল- বলল আর হয়ে গেল, যতসব! এমনিই জান নিয়ে টানাটানি। আবার ব্লাড ব্যাংকিং। কী আর করা, রাজামশাইয়ের হুকুম।

-আমি কিন্তু আপনার সাথে যামু না। আপনি খালি আমারে ডিসটার্ব করেন।

-কী। আপনার এত বড়ো সাহস আমার মেয়ের সাথে টাংকি মারেন!

-আহঃ থামো তোমরা। এভাবে ঝগড়া করো না। চলো, দল তৈরি করো। একেক দলে ১০ জন করে থাকবে। আর সবসময় সৈন্য প্রস্তুত রাখবে। কোনো দুর্ঘটনা হলে সাথে সাথে সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে দিবে। চলো সবাই মানুষ রাজ্যে...

-ঋন্তি জানালা বন্ধ করো। মশাগুলো ঘরে ঢুকে যাবে। আর কয়েল জ্বালিয়ে পড়তে বসো। ঋন্তি...

-দেখ মা, ওরা আমাদের একদম দেখতে পারে না।
- উহুঃ ইকরি! এদিকে আসো। এত কথা বলো না। ইস, এদের জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। চলো অন্যদিকে যাই। ওই যে ওই বাড়িটার জানালা খোলা। চলো ওই বাড়িটায় যাই।
-একি, এখনো জানালা বন্ধ করোনি? বলেই ঠাস করে জানালা বন্ধ করে দিলেন ঋদ্ধির মা। নাও কয়েলটা নিয়ে গিয়ে পড়তে বসো।
-কয়েল জ্বলছে, সাবধান পিছন ফিরে ঢুকো, না হলে চোখে ধোঁয়া লাগবে। ধোঁয়া লাগলে কিছুই দেখতে পাবে না। মেয়েটা একা আছে, চলো অ্যাটাক করি।
-লালিত্য মশারির মধ্যে যাও। মশারির মধ্যে বসে পড়ো। দেখছ না মশা ঘুরঘুর করছে। বললেন লালিত্যর মা।
লালিত্যর বাবা বললেন- আহঃ থাক না।
-যা খুশী করো- বলেই রান্নাঘরে গেলেন লালিত্যর মা।
বাবা-মেয়ে একসাথে মশারির মধ্যে ঢুকলেন।
-এরা আবার সন্ধ্যা না লাগতেই মশারির মধ্যে ঢুকে বসে আছে দেখছি। এ ঘরে কাজ হবে না। চলো পাশের রুমে যাই। এ কী, মশা পোড়া গন্ধ আসছে না। ইকরি, ইকরি কই?

-হা হা হা কেমন লাগে! বহুত জ্বালাইছ, এবার পুড়ে মরো। লাজুক মশা মারা ব্যাট দিয়ে মশা মারছে। পাশে বসে আছে তার খালামনি বেবী।
-আহঃ রাখ্ তো। ওদের কষ্ট হচ্ছে না।
-যখন কামড় দিয়ে ফুলায় দেয়, তখন বুঝো না। বলে লাজুক।
-এটা কী, এ জিনিস তো চীনে দেখেছিলাম। এখানে এলো কিভাবে।
-পাশে থেকে একটা মশা বলল, ওর মামা তো বিদেশে। সেই মনে হয় পাঠাইছে।
-চিকুকে ফোন করো, সৈন্য পাঠাতে বলো।
-আমাদের জায়গা পরিবর্তন করতে হবে চলো সবাই।
-হ্যালো চিকু, সৈন্য পাঠাও। আমরা তো ফিনিস হয়ে গেলাম।
-দেখো খালামনি ছোট্ট একটা মশা। এটাকেও খতম করে দেবো।
-মারিস না। ও তো তোকে কামড়ায়নি।
-আচ্ছা দেখো, চুপ করে বসো। এই যে দেখ হাতে বসছে, পেট ফুলছে... কি বুঝলা! বলেই ইলেকট্রিক ব্যাটটা দিয়ে ছোট্ট মশাটাকে পুড়িয়ে মারল।
-কী হলো ইকির মা, কাঁদছ কেন?
-ওরা আমার ইকিরকে মেরে ফেলছে।
-কী বলো, এই মাত্র না ওর কথা শুনলাম।
-থাক চলো, আমরা রাজ্যে ফিরে যাই।
-চলো, রাজার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এভাবে চলতে পারে না।
মশক রাজ চিরিমের রাজসভায় ইকির মা ইকির হত্যার বিচার চাইল। বিচার না হলে আমরণ অনশনের হুমকি দিল। আর তাও যদি ইকির হত্যার বিচার। সে নিজে তার মেয়ে হত্যার বিচার করবে। শুধু তাকে শক্তিশালী ক্ষমতাসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী দিতে হবে। যে মেয়েটা আমার ইকিরকে পুড়িয়ে মেরেছে তাকে আমি ডেঙ্গু জ্বরের ভাইরাস দিব। বলেই রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল ইকির মা।
রাজসভায় ইকির মা'র মতো আরো অনেক মশা এসে তাদের আপনজন হারানোর বিচার চাইল।
-এভাবে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। আমরা তো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছি। একটা কিছু করতেই হবে।
ওদিকে হঠাৎ করেই জ্বর উঠল লাজুকের। টেস্ট করে ডাক্তার জানালেন ওর ডেঙ্গু হয়েছে। তবে সিরিয়াস না, রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।
মশাদের প্রতিবাদ তীব্র আকার নিয়েছে। রাজা যখন বিচারে অপারগ, তখন নিজেদের বাঁচাতে, নিজেরাই উদ্যোগী হয়। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় ডাক্তারদের অ্যাটাক করবে, তুলে নিয়ে আসবে মশার কয়েল ও স্প্রে ব্যবসায়ীদের। যেই কথা, সেই কাজ। তারা তুলে নিয়ে আসে ডাক্তার, স্প্রে ও কয়েল ব্যবসায়ীদের।
টিভিতে সংবাদ দেখছেন লালিত্যর বাবা।
-দর্শকবৃন্দ এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেছে, মশক বাহিনী ডাক্তার, স্প্রে ও কয়েল ব্যবসায়ীদের অপহরণ করেছে। মশাদের বংশ রক্ষার্থেই এই অপহরণ।
-কী গো, দেখে যাও কী অবস্থা! সারাদিন তো

সিরিয়াল দেখো, খবর-টবর দিলে তো অন্য রুমে চলে যাও। দেখো কী অবস্থা। লালিত্যর মাকে ডাকলেন লালিত্যর বাবা।

-মশক রাজ্যে আছেন আমাদের রিপোর্টার লাবণ্য। আমরা সরাসরি লাবণ্যর সাথে মোবাইলে কথা বলি। হ্যালো লাবণ্য, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো...

-জ্বি বুশরা আমি শুনতে পাচ্ছি। কথা বলছি মশক রাজ্যের প্রধান সেনাপতি চিকুর সাথে।

-আচ্ছা আপনি কী ...।

-এই আপনি না, তুই বল। আমরা মশা বলে কী কোনো মানসম্মান নাই। আমরা তুই বলে সম্মান করি।

চিকুর কথা শুনে ভিমড়ি খেলো লাবণ্য।

-আচ্ছা দুঃখিত চিকু বল্ ...।

-এক মিনিট, হ্যালো দোস্ত, আমারে জঙ্গল টিভিতে লাইভ দেখাচ্ছে, দেখ। আর পারলে একটু ফেসবুকে আপডেট দিয়ে দে। হ্যাঁ বল্...

-বলছিলাম মানে তোরা (মনে মনে খুব ইতস্ত হয় লাবণ্য) কেন এই অপহরণের সিদ্ধান্ত নিলি।

-কেন নিবো না সেটা বল। আমরা মশা বলে কী আমাদের জীবনের কোনো দাম নাই। দুই হাতে চাপড়ায় মারে, কারেন্ট দিয়ে মারে আর কয়েল। ওই কয়েলের ধোঁয়ায় আমার ছেলের যক্ষা হয়ে গেছে। তাই আমাদের অবাধে চলতে দিতে হবে। মানুষ রাজার সাথে মশক রাজার সভা হবে। আমাদের কয়েকটা দাবি মানতে হবে।

-ভাবো আমাদের কী অবস্থা। আমরা মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ। আর মশারা আমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ।

-আহঃ খবরটা শুনতে দাও।

-না তোরা তো আমাদের খুব জ্বালাস, রোগের ভাইরাস দিস, আর কয়েলের ধোঁয়ায় আমাদের তো কত রোগ বালাই হয়।

-তাই বলে আমাদের মেরে ফেলতে হবে। আমরা কী না খেয়ে মরব। আমাদের মৌলিক অধিকার দিতে হবে। বলতেই অন্য মশারাও চিকুর সাথে বলে আমাদের দাবি... আমাদের দাবি... মানতে হবে... মানতে হবে...

-আচ্ছা তোরা ঠিক কী চাইছিস?

চিকু বলল, আমাদের মৌলিক অধিকার দিতে হবে।

-সুধী দর্শক এখন দেখার পালা, মানুষ রাজা আর মশক রাজার বৈঠক কবে হয়? আর সেই বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়? মশক রাজ্য থেকে লাবণ্য, জঙ্গল টিভি।

কয়েকদিন পর মশাদের প্রতিবাদের মুখে বৈঠকে বসেন মানুষ রাজা আর মশক রাজা।

আজ এক ঐতিহাসিক দিন। বৈঠকে বসেছেন মানুষ রাজা আর মশক রাজা।

চিরিম প্রথমেই তার মশা বাহিনীর সৈন্যদের পুড়িয়ে মারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলল- তোরা শুধু মুখেই বলিস, দেশি পণ্য কিনে হোন ধন্য, তাহলে চীনা ব্যাট দিয়ে আমাদের পুড়িয়ে মারিস কেন?

মানুষ রাজা এই অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের জন্য গভীরভাবে শোক প্রকাশ করলেন। তারপর শুরু হলো বৈঠক। প্রথমেই মশক রাজা :

১. আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. বসবাসের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।
৩. আমাদের পুড়িয়ে মারা যাবে না।
৪. বছরে দুই মাস আমাদের অবাধে বিচরণ করতে দিতে হবে।
৫. বিনোদনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

এবার মানুষ রাজার শর্তাবলি :

১. পরীক্ষার সময় পরিক্ষার্থীদের কামড়ানো যাবে না।
২. লেখাপড়া করার সময় বিরক্ত করা যাবে না।
৩. মশারির মধ্যে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় মুখমণ্ডলে কামড়ানো যাবে না।
৪. বছরে দুই মাসের বেশি থাকা যাবে না।
৫. বিনোদন নিজের বাসায় করবে, কানের কাছে ভুন ভুন পুন পুন করে গান গাওয়া যাবে না।

বৈঠক শেষে দুই রাজা করমর্দন করে চুক্তিপত্রে সাক্ষর করলেন।

-দর্শকমণ্ডলী, আপনারা দেখলেন ঐতিহাসিক চুক্তি বৈঠক। ধারা বর্ণনায় ছিলেন- লাবণ্য অদিতি।

-এই ছোটো মামা ওঠো, কি ঘুম ঘুমাও, ছোটো মামা... দেখো মশা কামড়িয়ে তোমার কী অবস্থা করেছে! বলেই তার ছোট্ট হাত দুটি দেখালো লালিত্য।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন লালিত্যর ছোটো মামা। বললেন- আর চিন্তা নেই ভাগ্নে, মশাদের সাথে চুক্তি হয়েছে। কিন্তু মুখমণ্ডলে তো কামড়ানোর কথা ছিলো না। তার মানে তো ওরা চুক্তি মানছে না। লাজুক ইলেকট্রিক মসকিটো ব্যাটটা নিয়ে আসো তো...

সুন্দরবন

ওয়াহিদুজ্জামান

আয় আয় আয় দেখবি যদি
যায় বয়ে যায় নিরবধি
একটি নদীর অনেক শাখা
সাপের মতন আঁকাবাঁকা।
জোয়ারে তার প্রবল ধারা
কূল ছাপানো বাঁধনহারা।

দুই কূলে তার কীসের ছায়া?
হাতছানি দেয় বনের মায়া।
শ্যামলা বনের সুন্দরি আর
কেওড়া-গরান-গোলপাতা তার
ডালপালাতে পাখির মেলা
কিচমিচকিচ সারাবেলা।

বনকুক্কুট-ময়না-টিয়ে
দেয় যে গানে মন ভরিয়ে!
চপলমতি বানর অতি
ব্যাঘ্র মামার ক্ষিপ্রগতি।
সোনার হরিণ চায় যে পেতে
ভাল্লাগে তার মাংস খেতে।
হায় মায়াবী হরিণ ছানা
বন গহিনে পালিয়ে যা না!

ম্যানগ্রোভ গাছ বাড়ছে পাঁকে
গুঁই-অজগর সেথায় থাকে।
মৌচাকে মৌ হাজার মাছি
বাওয়ালি রয় কাছাকাছি।
মৌ-লোভী চাক নেয় যে কেটে।
কেউবা ঢোকে বাঘের পেটে।

ঘাপটি মেরে থাকছে কেরে?
বনদস্যু আসছে তেড়ে
মারছে কারা বনের প্রাণী?
শত্রু তারা দেশের জানি।
সবার কাছে জোর মিনতি
করবে না কেউ বনের ক্ষতি।

রূপসাগরের মানিক রতন
এই আমাদের সুন্দরবন।

ঘুম ভাঙালো ডাহুক ডেকে

মনসুর আজিজ

চরের জীবন ঘুম ভাঙালো ডাহুক ডেকে ডেকে
সোনার ছবির স্বপ্ন দিল ভোরের সূর্য এঁকে
ওই যে সবুজ অবুঝ বালক ডাকছে কাছে যেতে
বন্ধু হবার ভাব জমাতে আমায় কাছে পেতে
দুর্বা ঘাসের শিশির ছুঁয়ে যাই সবুজের কাছে
শর্ষে ক্ষেতের হলুদ মেয়ে চলছে পাছে পাছে।

লম্ফ দিয়ে উঠল জেগে বিলের জিয়ল মাছ
বিশাল বপুর বুকটি বাড়ায় মোড়ের অশত্থ গাছ
বাঁক নিয়েছি একটু ডানে কলাই ক্ষেতের পাশে
নীল বরণের দুষ্টু মেয়ে খিলখিলিয়ে হাসে
একটু চেয়ে ছুটছি আবার ওই সবুজের দিকে
মটর ক্ষেতে পা জড়ালো লতাটি লিকলিকে।

কোথায় গেল সবুজ বালক কোথাও দেখি নাই
চারিদিকেই অবুঝ অবুঝ; সবুজ খুঁজে পাই।

গাছের কথা

মিলি হক

বৃক্ষরা কথা বলে
বটগাছে ঝুরি থাকে
হিজল গাছে ঝুরি নামে
ফুলগুলি ঝরে গেলে, পুকুরের পানিতে।

লতা গাছ হেঁটে যায়
পুঁই মাচা ভরে যায়
হেঁটে হেঁটে ভেসে যায়
পানা যত নদীতে।

প্রভাতে শিউলি ঝরে
ফোঁটে সন্ধ্যায় মালতি
ঝিঙ্গে ফুল হেসে উঠে
জোছনার আলো কী?

বৃক্ষের জীবন আছে
আলো চাই পানি চাই
শিশুদের মতো তারা
মুখে শুধু ভাষা নাই ॥

শিলুদের ব্যালকনি

দিলারা মেসবাহ

ছোট্ট বন্ধুরা, এ শহরে বেবিলনের শূন্যদ্যানের এক টুকরো আদল যদি দেখতে চাও তবে শিলুদের ব্যালকনি এক নজর দেখে যেও। ওদের ব্যালকনিটার বিশেষত্ব হচ্ছে ওটা বেশ খানিকটা লম্বা চওড়া। চারকোণা। বেশ কিছু সতেজ সবুজ গাছগাছালির শোভা ব্যালকনি জুড়ে। হিবি-জিবি গাছলতা নয়। নান্দনিক শোভায় মন জুড়িয়ে যায়। ব্যালকনির ছোট্ট অপূর্ব বাগানটির যত্নআত্তি করেন শিলুর মা। সঙ্গে শিলুও রোজ ঘণ্টাখানেক সময় দেয় লতাপাতার এই মায়াবী দুনিয়ায়। রোদও কার্পণ্য করে না। ঢেলে দেয় সোনা রং বেশ খানিকটা সময়। তাইতো এই শূন্যদ্যানে ফোটে ইয়েলো কসমস, নাইন ও ক্লক, আলমান্ডা, বাগানবিলাস। সবচেয়ে যে লতাটি শিলুদের বন্ধুদের পাগল করে সেটা হচ্ছে মাধুবীলতা। অবলীলায় মাটি থেকে বেয়ে বেয়ে ওদের পাঁচতলার ব্যালকনিতে ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। লাল নীল কুশন দিয়ে সাজানো হালকা বেতের চেয়ারগুলো যেন হাসিমুখে অপেক্ষা করছে। 'তোমরা এসো খানিক জিড়িয়ে যাও, মন ভালো করে যাও'-এমনি যেন ওদের অব্যক্ত ভাষা.....।

শুক্রবার সারাটা দুপুর শিলু, মৌমিতা, ঝন্টু বারান্দায় জম্পেস আড্ডা জমিয়েছিল। ভরপেট ভুনা খিচুড়ি সর্ষে ইলিশের ভোজ হয়েছে। আবার দুপুর একটু গড়াতে না গড়াতেই শিলুর মামনি তালপিঠা, টমেটো কুচি দিয়ে মাখানো ঝালমুড়ি নিয়ে এলেন। মৌমিতা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'আন্টি আবার কেন এত কষ্ট করছেন?' ট্রে টেবিলে নামিয়ে শিলুর মামনি বসলেন। ঝন্টু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে উঠল, 'আন্টি এই মাধবীলতার বয়স কত?' আন্টি বললেন হাসিমুখে, 'শোনো ঝন্টু এই সাদা লাল সুগন্ধি ফুলের ঝোপা দুলছে যে লতা গাছটিতে এর নাম আমরা ঢালাওভাবে বলে থাকি মাধবীলতা। কিন্তু এর নাম বলদা-গার্ডেনে লেখা ছিল মাধুরীলতা। মাধবীলতা অন্য রকম ফুল। দেখা মেলা ভার। রবি ঠাকুরের গানে আছে না, 'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এলে ফাগুন-দিনের স্রোতে/এসে হেসেই বলে, যাই যাই যাই।' 'মাধুরী লতা' দীর্ঘজীবী লতা। থোকা থোকা ফুল ফুটে থাকে দীর্ঘদিন। যাই যাই করে না মোটেও। মধুমঞ্জুরি লতাও এর নাম। 'মাধবীলতা' কিন্তু ভুল নাম।

শিলুও অনেক ফুলের নাম ঠিকঠাক জানে। বন্ধুদের জানায়। টবে বেলি, কামিনী ফুটেছে সুবাসে ম' ম' করছে। শিলুর যখন অঙ্ক কষতে কষতে মাথার নাট বল্টু ঢিলে হয়ে যায়, তখন এই সবুজ ব্যালকনি ভরসা। খানিকটা সময় ফুটি ফুটি কলি, পাপড়ি মেলানো লাল, হলুদ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, তখন সব প্যাঁচ খুলে খুলে যায়। মনটা তরতাজা হয়ে যায়।

এ্যালার্ম বাজছে...পাখির কিচির মিচির রেকর্ড। শিলু উঠে পড়ে। এখন তার কিছুক্ষণ ব্যালকনিতে কাটানোর সময়। মা রোজ সকালে রুটিনমাফিক ভাত, ছোটো ছোটো করে ছেঁড়া পাউরুটির টুকরো ছড়িয়ে দেন ব্যালকনিতে। এক ঝাঁক চড়ুই রোজ দানা খুঁটে খায় আর কিচির মিচির করে কত কথাই যে বলে। কালো কাকগুলোও ছোঁক ছোঁক করে। যেন হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যায়। শিলু মাঝে মধ্যে ছোট্ট গুলতি দিয়ে ইটের টুকরা কাকগুলোকে তাক করে ছুঁড়ে মারে।

শিলু আজ কোন দেশে যে হারিয়ে গেছে, সে নিজেই জানে না। সে যেন স্পষ্ট শুনতে পেল। একটা চড়ুই বলছে, 'তোমরা ডাস্টবিন ঘাটো সেখানেই যাও না কেন ভাই? এখানে কেন ওঁত পেতে বসে আছো?' একটা রাতি পাতিকাক কা কা করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল, 'শোন, একটুখানি চড়াই পাখি। অত বড়াই করা ভালো নয়, আমরা যে গায়ক পাখি তাকি তোমরা জানো? প্রাণী বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের গলায় সুরের বাক্স আছে। যাকে ইংরেজিতে বলে Voice Box। বুঝেছ? লেখাপড়াতো কিছুই করো নাই।' ঝাঁকের মুরুব্বি চড়ুই এবার কিচমিচ করে ওঠে, 'হয়েছে খুব হয়েছে। পণ্ডিতি ফলাতে এসেছ-না? শিলু আপা তোমাদের দাওয়াত দেয়নি। কি গানের ছিরি! কান ঝালাপালা হয়ে যায়। আমরাই তো রোজ সকালে মিষ্টি করে গান গেয়ে শিলু আপার ঘুম ভাঙাই। এখন যাওতো বাপু....ইস্ গা দিয়ে পচা গন্ধ!' পাতি কাক রেগে আগুন। কা কা করে বলে ওঠে, 'কী বললে-আবার বলোতো? আমরা রোজ গোসল করি, রোজ। ঝট্‌পট্। তাইতো একটা শব্দ চালু আছে 'কাক-স্নান'। কিছুইতো জানো না। খালি খাই খাই। দালান কোঠার ফাঁক ফোকরে বাসা করো। শরম করে না? আমরা কত কষ্ট করে খড়কুটো দিয়ে সুন্দর বাসা বানাই। আবার কোকিলের ডিমগুলোকে তা দিয়ে ছানা ফোটাই। খাও, পেট ফাটিয়ে খাও। কাউকে দিয়ে খেতে শেখোনি।' বলেই–পাখার ঝাপটা মেরে উড়ে গেল ওরা। কোথায় কে জানে!... শিলু যেন এতক্ষণে কল্পজগত থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। শিলু মাঝে মধ্যে লতাপাতা ফুলের সঙ্গেও কথা বলে। ওরা কথা কয় না-কিন্তু অনেক কথা আঁকা থাকে ওদের অবয়বে। পড়তে জানে কয়জনে!

শিলুর মামনি গত পরশু রায়ের বাজার থেকে একটা মাটির 'চাড়ি' কিনে এনেছেন। চড়ুইগুলো ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁট ডুবিয়ে পিপাসা মেটায়। আবার নাচতে নাচতে গোসলও করেছিল। কী চমৎকার বায়োস্কোপ। শিলু দেখেছিল মুগ্ধ হয়ে।

ছুটির দুপুরবেলা শিলুর এখনও গল্প শোনার বাতিক আছে। এ এবার ক্লাস এইটে পড়ছে। মেধাবী ছাত্রী। ওর আছে অজানাকে জানার কৌতূহল। শনিবার দিন ভরদুপুরে মায়ের পরিপাটি বিছানায় গুটিশুটি হয়ে বসে শিলু বলল, 'মা আজ পাখিদের গল্প বলো- প্লিজ বলো।' মেয়ের আদুরে আবদার শুনে মা হাসেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প জুড়ে দেন, 'বেশতো শোনো মন দিয়ে। পাখিরাও কিন্তু কাঁদে দুঃখ পেলে। আবার বাসা বানানোর সময় গানও গায়। আরও মজার কথা ওরা বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময়ও গান গায়। আর আদরও করে গানে গানে। এই গানওয়ালা পাখিদের মধ্যে এক নম্বর হলো মৌটুসী আর নীল টুনি। আর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে ওরা মহানন্দে নাচেও।' মায়ের মধুর বুলিতে প্রিয় পাখি সমাচার শুনে শিলুর ডাগর ডাগর চোখের তারাও নাচতে থাকে। আনন্দে চনমন করে ওঠে মন। মিষ্টি করে বলে, 'দারুণ! পাখিরা এতকিছু পারে?' মা বলেন, 'তুই যে পাতিকাগুলোকে দুই চক্ষে দেখতে পারিস না, কিন্তু জানিস তো ওদের দুই একটা গুণ আছে বৈকি। ওরা ভ্রমণ করতে ভালোবাসে। ধানমন্ডির কাক উড়ে উড়ে চলে যায় শনির আখড়া, গাজীপুরের কাক উড়াল দিয়ে আসে ঢাকা। প্রয়োজনে ওরা একতাবদ্ধ হতে জানে। একটা কাক মারা গেলে ঝাঁকে ঝাঁকে কাকা উড়ে আসে। কা-কা করে চারপাশটা একেবারে প্রতিবাদমূখর করে তোলে। শিলু ঘাড় নেড়ে বলে, 'আচ্ছা আমি ওদের আর গুলতি মেরে জখম করব না। ওদের মাঝে মাঝে খেতে দেবো। কিন্তু ওরা যেন আমার চড়ুই বন্ধুদের বিরক্ত না করে।' মা মৃদু হাসতে থাকেন। আলতার মা ট্রে ভর্তি ধোঁয়া ওঠা চা, চিড়ে ভাজা নিয়ে হাজির। শিলুর মামনি সানন্দে চায়ের কাপটি তুলে নেন। কী শীত কী গ্রীষ্ম শিলুর মামনি দিনে প্রায় সাত আট কাপ চা খান। চায়ে আয়েশ করে চুমুক দিতে দিতে বলেন, 'বড়ো হয়ে সলিম আলীর মতো পাখি বিশারদ হতে চাস? গাছগাছালি বিশারদ দ্বিজেন শর্মা! তাহলে তোকে মাঠে-ঘাটে, গ্রাম-গঞ্জে, বিলে-ঝিলে, জঙ্গলে যেতে হবে। নইলে পাখিদর্শন হবে না। ফুল, লতা চিনবি না। হাতে থাকবে বাইনোকুলার আর ভালো ক্যামো। কি পারবিতো?' শিলু কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে বলে, 'হুঁ বুঝে গেছি। কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে না।' মা এবার মায়াবি গলায় বলেন, 'ভবিষ্যৎ জীবনে যত ব্যস্তই থাকিস না কেন, তোর চারপাশে যেন মায়াবী সবুজ প্রকৃতি থাকে। সবুজায়ন ছাড়া তোমার আমার সারা দুনিয়ার কী ক্ষতিটাই না হচ্ছে! আমাদের আরো বেশি আন্তরিক হতে হবে, মনোযোগী হতে হবে। কথায় নয় কাজে।

শিলু মায়ের দামীদামী কথাগুলো মোটামুটি বোঝে। মনে মনে গুণগুণ করে, 'ফুল পাখিদের আমি খুব ভালোবাসি মা-মনি। আর ভালোবাসি আমাদের এই ছোট্ট ব্যালকনি। আমার প্রকৃতি পাঠের প্রিয় পাঠশালা।

বুবলির গল্প

মালেকা পারভীন

সন্ধ্যার পরপর মা বুবলিকে নিয়ে পড়াতে বসলেন। সপ্তাহের আর পাঁচটি দিনের মতো। দুটি ছুটির দিনের নিয়ম একটু অন্যরকম। প্রতি সন্ধ্যায় মা খাবার টেবিলের একটা কোনা পরিষ্কার করতে করতে বুবলি তার স্কুলের ব্যাগ নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর চেয়ার টেনে বসে ব্যাগ থেকে বই-খাতা বের করতে থাকে।

বুবলি এ বছর তৃতীয় শ্রেণিতে উঠেছে। ক্লাসে তার রোল সাত। আজ বাংলা আপা তাদের ক্লাসে পড়ানোর সময় পরিবেশ নিয়ে কিছু কথা বলেছেন। সবটা না হলেও

বুবলি এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, আমাদের জীবনে সবুজ গাছপালার খুব প্রয়োজন। তাই সুযোগ পেলে প্রত্যেকের বাড়ির আশেপাশে গাছ লাগানো উচিত।

বুবলিকে এ বিষয়টা খানিকটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তারা ছোটো একটা বাসায় থাকে। দুটা রুমের সাথে বারান্দা থাকলেও সেখানে খুব বেশি জায়গা নেই। এরমধ্যে একটা বারান্দায় মা কয়েকটা ছোটো ক্যাকটাসের টব রেখেছেন। এটাই তাদের শখের বাগান, মা বলেন।

বুবলি তার বাড়ির কাজের ডায়েরিটা খুলে মা'র সামনে দেয়। বাংলা আপার দেওয়া কাজটা দেখে মা বুবলির দিকে তাকান।'গাছ আমাদের বন্ধু' এ বিষয়ে দশ থেকে পনেরোটি বাক্য লিখতে হবে। আলাদা পাতায় লিখে আগামি বৃহস্পতিবার জমা দিতে হবে। আজ সোমবার সন্ধ্যা। হাতে আছে দুটা দিন।

মা ভুরু কুঁচকে কিছু একটা ভাবলেন। তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে বসার ঘরের দিকে গেলেন। বুবলি এখান থেকেই বুঝতে পারল, মা তাঁর বইয়ের আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন মোটা একটা বই নিয়ে। বইয়ের ওপর যাঁর ছবি বুবলি তাঁর নাম জানে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা' লিখেছেন তিনি। বুবলি তাঁর লেখা আরো দুটি ছড়া পড়েছে। আগের ক্লাসে থাকার সময় মুখস্থ করেছিল 'ছুটি' আর 'আমাদের ছোট নদী'। স্কুলের অনুষ্ঠানে একটা ছড়া আবৃত্তি করে পুরস্কারও পেয়েছিল।

যে বইটা মা হাতে করে নিয়ে এলেন, সেটাও বুবলির খুব চেনা। প্রায় মাকে দেখে বইটা খুলে পড়তে। এমনকি তাকে নিয়ে যখন পড়াতে বসেন আর কোনো একটা বাড়ির কাজ শেষ করতে দেন, তখনো মাঝে মাঝে মা বইটা নিয়ে পড়তে থাকেন। বুবলি ভাবে, মা যেহেতু লেখালেখি করেন, হয়ত সে কারণে বইটা তার জন্য খুব দরকার। আরেকটু বড়ো হলেই নিজেও পড়ে ফেলবে, ভেবে রেখেছে সে। মা'র মতো তারও বই পড়তে ভীষণ ভালো লাগে। বাবা মজা করে বলেন, যেমন মা তেমন মেয়ে। বাবার কথা শুনে বুবলি আর মা মিলে হাসে।

কিন্তু এখন মা'র মুখটা একটু অন্ধকার। কেন বুঝতে পারে না বুবলি প্রথমে। মা যখন বইটা খুলে কোনো একটা লেখা খুঁজে বের করতে সূচিটা দেখতে থাকেন, কেবল তখনই বুবলি বুঝতে পারে। নিশ্চয়ই এমন কিছু যেটার সাথে তার বাংলা বাড়ির কাজের যোগ আছে। তা না হলে এমন সময় মা বইটা হাতে নিতেন না।

বইটার নাম 'গল্পগুচ্ছ'। মা বলেছেন; সেও এখন সহজেই পড়তে পারে। এই বইয়ে অনেক অনেক গল্প আছে। তার মধ্যে থেকে মা তাকে কয়েকটা শুনিয়েছেন। 'ছুটি' গল্পটা বুবলির খুব প্রিয়। ফটিক নামের ছোটো ছেলেটার কথা মা যখন শেষ করেন, তখন তাদের দুজনের চোখেই পানি জমে ওঠে। আজো নিশ্চয়ই মা তাকে আরেকটা গল্প শোনাবেন।

বুবলির মনের কথাই ঠিক হয়। মা চোখের সামনে বইটা খুলে বলেন, 'আজ তোমাকে 'বলাই' নামের ছোট্ট একটা ছেলের গল্প শোনাবো। যে গাছ খুব ভালোবাসত। আরো আগেই শোনাতে চেয়েছিলাম। আজ বাংলা ক্লাসে আপা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন, বলাই-এর গল্পটা জানলে বিষয়টার প্রতি তোমার আলাদা কৌতূহল হবে। পরিবেশ, সবুজ গাছপালা, প্রকৃতি এসব এমনিতে একটু খটোমটো লাগে। কিন্তু যদি এমন কিছু দিয়ে এই খটোমটো বিষয়টা শুরু করা যায় যেটা শুনতে ভালো লাগবে, তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারা তোমার জন্য সহজ হবে।'

বুবলি মা'র কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে। মা সবসময় এমন সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলেন। তার মনে হয়, নিশ্চয়ই বলাই-এর গল্পটা শোনার পর বাংলা বাড়ির কাজটা করা সহজ হবে। মা তাকে এভাবে যে কোনো কঠিন বিষয় পড়াবার আগে একটা মজার কোনো গল্প বা ঘটনা বলার চেষ্টা করেন। যাতে সেই কঠিন বিষয়টা তার পক্ষে বুঝতে সহজ হয়। বুবলি এখন মা'র মুখ থেকে ছোট্ট ছেলে 'বলাই' এর গল্পটা শোনার জন্য বেশ অস্থির হয়ে ওঠে।

নীলিমার জন্য উপহার

বিন্দু সাহা

সেদিন বাবা নীলিমার জন্য দুটি গাছ নিয়ে এল। নীলিমা গাছ দুটি দেখে ভীষণ খুশি। ওকে সবাই অনেক কিছুই উপহার দিয়েছে। কিন্তু কেউ গাছ উপহার দেয়নি। বাবাই প্রথম ওকে গাছ উপহার দিল। নীলিমা আর বাবা মিলে খুব আনন্দের সাথে বারান্দায় দুটি টবে গাছ দুটি লাগিয়েছিল। নীলিমা প্রতিদিন দু'বেলা গাছে পানি দেয়। গাছগুলোর প্রতি সতর্ক নজর রাখে। যাতে পিঁপড়া গাছগুলোর কোনো ক্ষতি করতে না পারে। গাছগুলোর সাথে কথাও বলে। সেদিন পিকলু ভাইয়া বলল গাছ নাকি গান শুনতেও ভীষণ ভালোবাসে। শুনে তো নীলিমা অবাক! তাও আবার হয় নাকি?

পিকলু ভাইয়া বলল কেন হবে না? গাছের তো প্রাণ আছে। তাহলে ও গান শুনতে পারবে না কেন? উহ! পিকলু ভাইয়াকে তা তো বলা হয়নি। পিকলু ভাইয়া হচ্ছে নীলিমার মামাতো ভাই। কলেজে পড়ে। অনেক বুদ্ধি। অনেক কিছু জানে।

শুনে নীলিমা খুব খুশি হয়। নীলিমা প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে গাছগুলোকে আদর করে। গান গেয়ে শোনায়। কিন্তু একদিন নীলিমার মনে হলো ওর গান শুনে গাছগুলো খুশি হয় কিনা তাতো ও বুঝতে পারছে না।

সন্ধ্যায় বাবা অফিস থেকে ফিরলে নীলিমা ছুটে যায় বাবার কাছে। বাবা, বাবা পিকলু ভাইয়া বলেছে গাছ নাকি গান শুনে আনন্দ পায়। আমি তো প্রতিদিন গাছকে গান শোনাই। গাছ আমার গান শুনে আনন্দ পায় কিনা বুঝব কী করে?

বাবা নীলিমাকে কোলে তুলে নিয়ে বারান্দায় যায়। বাবা বলে তোমার গাছগুলো তো বেশ সুন্দর হয়েছে।

বাবার কথা শুনে নীলিমা ভীষণ খুশি হয়। বাবা বলে তোমার গান শুনে গাছেরা খুব খুশি হয়।

নীলিমা অবাক হয়ে বলে কীভাবে বুঝলে?

বাবা বলে বুঝতে পারছ না। দেখছ, গাছগুলো কি সুন্দর হয়েছে। তুমি যে ওদের ভালোবাসো, যত্ন করো-তাই ওরা এত সুন্দর হয়েছে। তুমি ভালোবেসে ওদের গান শোনাও, তাইতো ওরা এত সতেজ ও সজীব হয়ে উঠছে।

বাবার কথা শুনে নীলিমার কী যে ভালো লাগে। গাছদের প্রতি ওর ভালোবাসা গাছেরা বুঝতে পারছে। আনন্দে নীলিমা পাতাগুলোতে হাত বুলিয়ে দেয়।

একদিন গাছগুলোতে কলি আসে। তারপর ফুলও ফুটে। সাদা সাদা বেলি ফুল আর লাল লাল জবা ফুল। লাল সাদা আর সবুজে বারান্দাটা কেমন সেজে উঠছে। মাঝে মাঝে গাছগুলোতে কিছু পাখিও আসে। গাছ লাগানোর আগে কখনো আসত না। দু-দিন পর ফুলগুলো আস্তে আস্তে ঝরে যেতে লাগল। তাই দেখে নীলিমার কী মন খারাপ! মা যতই বলে এই ফুলগুলো ঝরে গিয়ে আবার নতুন কলি আসবে তবুও নীলিমার মন ভালো হয় না। মা কত আদর করে। গান শোনায়। গল্প বলে। কিন্তু নীলিমার মন পড়ে থাকে ফুলগুলোর কাছে। আহারে, কী সুন্দর ফুলগুলো। এভাবে ঝরে যাবে।

বাবা অফিস থেকে ফিরলে নীলিমা বাবাকে বারান্দায় নিয়ে যায়। বাবা দেখ, ফুলগুলো ঝরে যাচ্ছে।

বাবা বললেন এটাই তো নিয়ম। এগুলো ঝরে যাবে। আবার নতুন কলি আসবে। ফুল ফুটবে। তারপর সেগুলোও ঝরে যাবে। এভাবেই চলবে। মানুষ, পশু পাখি সব প্রানীর ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম। তবে ফুলগুলোর সৌন্দর্য ও সুবাস তোমার মনে রয়ে যাবে। মানুষের কাজের সৌন্দর্য ও সুবাসও অন্য মানুষের মনে রয়ে যায় বাবা।

বাবা বলে, হ্যাঁ মা।

নীলিমা ঝরা ফুলগুলোকে বিদায় জানিয়ে নতুন ফুলের অপেক্ষায় থাকে।

স্মৃতি

সরদার আবুল হাসান

মনের ভেতর বইছে কেবল
উথালপাতাল ঢেউ
দূর আকাশে হাতছানিতে
ডাকছে আমায় কেউ।

মাকে হারাই ছোট্টবেলায়
বাবাকে তার পরে
এমনি কাটে দুঃখের সময়
একলা বসে ঘরে।

বাবার কথা যায় না ভোলা
কী আর করি বলো
মায়ের কথা পড়লে মনে
অশ্রু টলমল।

বুবুই ছিল খেলার সাথি
সেও যে দিল ফাঁকি
কষ্টগুলো বুকের ভেতর
যত্নে পুষে রাখি।

সময় ছোটে উল্কাবেগে
জমছে স্মৃতির ধুলো
একলা আমি বয়ে বেড়াই
আমার ব্যথাগুলো।

আকাশ আর আমি

রেজিনা ইসলাম

নীলের সাথে মিশে মিশে হলো নীলাভ চর
বিভোর হয়ে স্বপ্নে দেখি আকাশ আমার ঘর
সেই আকাশে উড়ি আমি উড়ি
আমি যেন নীলের আভার নুড়ি।

রৌদ্র আলোয় গা ডুবিয়ে আকাশ যখন হাসে
আমি তখন মুগ্ধ হয়ে একটু বসি পাশে
রাঙা আলোয় উড়ি আমি উড়ি
আমি যেন আকাশ মেয়ের চুড়ি।

আকাশ ফুঁড়ে বিষ্টি যখন ঝমঝমিয়ে ঝরে
মনটা আমার শান্ত নিঝুম উদাস হয়ে পড়ে
ধূসর আলো চোখে মেখে উড়ি
আমি যেন মেঘের আঁকা ঘুড়ি।

ভন ভনাভন পাগলা ঝড়ে আকাশ থাকে রেগে
গুরুম গুরুম বিজলি বাতি নামে ভীষণ বেগে
আমি তখন ভয়ে কেঁপে উড়ি
যেন এটা দৈত্য দানব পুরী।

রাতের আকাশ তারার মেলা চাঁদের আলোর চুম
কালোর ফাঁকে ইলিক ঝিলিক দেয় পাড়িয়ে ঘুম
আমি তখন ঘুমে ঘুমে উড়ি
আমায় দেখে হাসে চাঁদের বুড়ি!

নতুন চাঁদ

বোরহান মাসুদ

একটি নতুন চাঁদ
আনন্দে আজ হারিয়ে গেলো
অন্ধকারের ফাঁদ।

চাঁদ ওঠা ঐ ভোর
ভোর এসে আজ তাড়িয়ে দিল
মনের সকল ঘোর।

ঘোর কাটা এই দিন
সবার জন্য ঈদ আনন্দ
আপন করে নিন।

দূরের মানুষ কাছের মানুষ

এমরান চৌধুরী

গতকাল থাক কালের গর্ভে
আজকে খুশির দিন
চলো আজ সবে মহাউচ্ছ্বাসে
বাজাই খুশির বীণ।

ঈদ মানে খুশি—পাল তোলা নাও
খুশি নয় কারো একার
আসমানি চাঁদ সবার সমান
সবার সুযোগ দেখার।

আকাশের নীলে তালের শিখরে
যদি করো উঁচু ঘাড়
কলিমুদ্দির কাঁচির মতোন
দেখা পাবে মুখ তার।

এক ফালি চাঁদ জোর কত তার
ভেদাভেদ করে চুর
খামার বাড়ির চাল ছুঁয়ে নামে
আলোর সমুদ্দুর।

লাল টুকটুক তরমুজ মুখ
জামা দেয় হাতছানি
এ দিনের কাছে মানুষই বড়ো
বড়ো নয় খানদানি।

কারো সাথে আজ খুনসুটি নয়
সকল দুয়ার খোলা
যখন ইচ্ছে প্রজাপতি মন
দিতে পারে তাই দোলা।

ঈদ মানে তাই সবার আপন
মায়ের গলার স্বর
দূরের মানুষ কাছের মানুষ
কেউ কারো নয় পর।

লক্ষ্মী সোনা

জাকির হোসেন চৌধুরী

কাঁদছে খোকন মায়ের কোলে,
হরেক রকম খেলনা ফেলে।
মা বলে তাতেই- 'কাঁদছো কেনো?'
বলে খোকন- 'ঐটা আনো'।

'কি বলো সব, বুঝি না ছাই
কান্না করো হর-হামেশাই।'
কেঁসে বলে খোকন সোনা-
'চাই কি আমি, তাও বুঝো না?

গাছের ডালে দোয়েল পাখি,
নিত্য করে ডাকাডাকি।
সেই পাখিটা দাও না ধরে,
পুষব আমি খাঁচায় পুরে।'

মা হেসে কয়- 'লক্ষ্মী সোনা-
বনের পাখি পোষ মানে না।
যেমনি আছে থাক সে বনে,
গান করুক না আপন মনে।

বন্যেরা জেনো- সুন্দর বনে,
তুমি খোকন, মায়ের সনে।

বাবার অবদান

এস এম শহীদুল আলম

আকাশ ছোঁয়া উদারতায় আগলে যিনি রাখেন
কচি মুখের দেখতে হাসি অপেক্ষাতে থাকেন
শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি ঝড়ে দিন-রজনী খাটেন
উঠতে বেড়ে বড়ো বাধার পাহাড়গুলো কাটেন
বাবার শ্রম বাবার হাসি ঈশ্বরের এক দান—
সর্বকালে জয়ী হওয়া বাবার অবদান॥

বৃক্ষলতার ছায়ার মতো বাবার ভালোবাসা
ফুলের মতো ফুটতে থাকে স্বপ্ন এবং আশা
গড-মনীষী বিশ্ব খুশি বাবা খুশি হলে
বাবার দোয়ায় পথে পথে আলোর বাতি জ্বলে
গল্প-ছড়া-গান-কবিতা যত গুণগান—
জীবন পথে এসব পুঁজি বাবার অবদান॥

আলো বাতাস ঘ্রাণ ছড়ানো বাবার মহৎ নেশা
সোনার টুকরো মানুষ করা তুলনাহীন পেশা
বৈরী হাওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে সারাজীবন লড়েন
সোনা রুপার সুখের জন্য কত কিছু করেন
ভরণ-পোষণ খাদ্য সেবা দিয়েই শুধু যান—
ছোট্ট থেকে বড়ো হওয়া বাবার অবদান॥

ছোটোদের জন্য বিনোদন

ঈদ ধারাবাহিক 'ছোটকাকু'

সৈয়দ মহিদুর রহমান

শিশুদের যথাযথভাবে বেড়ে উঠার পেছনে বিনোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুস্থ এবং নির্মল বিনোদন শিশুর মনোজগতে রুচিশীলতার জন্ম দেয়। সে হয়ে উঠে একজন পরিশীলিত মানুষ। আমাদের অনেক উদাসীনতার মাঝে শিশুদের নিয়ে ভাবনার জায়গাটা নিতান্তই সীমিত। যার প্রেক্ষিতে আজ আমাদের সমাজে নানাবিধ অস্থিরতা। কারণ শিশুরা তাদের মন-মননে সুনাগরিক হয়ে উঠার উপাদান কিছুই পায় না।

এমনি সব হতাশার মাঝে বিন্দু বিন্দু আলোর কণার মতোই মাঝে মাঝে আমরা দু-একটা আলোর রেখা দেখি। যা নিয়ে কথা বলা জরুরি বলেই— এ লেখার আয়োজন। ফরিদুর রেজা সাগর একজন সচেতন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে পারিবারিকভাবে পাওয়া প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি দীর্ঘদিন যাবত শিশুদের জন্য লেখালেখি করে যাচ্ছেন। তাঁর এ নিরলস শ্রমের দামি ফসল ছোটোদের জন্য লেখা ধারাবাহিক গোয়েন্দা গল্প 'ছোটকাকু'।

ফরিদুর রেজা সাগরের এ মূল্যবান লেখাটি ছোটোপর্দায় এখন ছোটোদের জন্য ঈদ আনন্দের এক নতুন উপযোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ছোটকাকু গল্পগুচ্ছকে এখন প্রতি ঈদের জন্য আট পর্বের ধারাবাহিক হিসেবে নির্মাণ করছেন— এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা আফজাল হোসেন।

ইতিমধ্যেই এ ধারাবাহিকটি ছয়টি শিরোনামে ছয়টি ঈদে চ্যানেল আইয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। নির্মিত ধারাবাহিকগুলোর নাম— কক্সবাজারে কাকাতুয়া, রাজশাহীর রসগোল্লা, লেট করে সিলেটে, রাগ করে রাঙামাটি, দিন দুপুরে দিনাজপুরে' এবং সর্বশেষ কুয়াকাটায় কাটাকাটি।

প্রতিটি পর্বেই নির্দেশনার পাশাপাশি আফজাল হোসেন নিজে মূল চরিত্র 'ছোটকাকু' হিসেবে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও তার সাথে নিয়মিত অভিনয় করছে অর্ষা, সীমান্ত, তানভীর হোসেন প্রবাল প্রমুখ। ছোটোদের জন্য কৌতূহল ভরা টান টান গল্পের এ ধারাবাহিকটি ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে আলোচিত।

ছোটোদের জন্য কাজ করতে হলে তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। স্বাভাবিকভাবে বড়োরা ভেবে থাকে- ছোটোরা কী বোঝে! অথচ ছোটোদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশলেই অনুভব করা যায়, প্রতিটি শিশুই বড়োদের মতো সচেতন। গোঁজামিল দিয়ে শিশুদের কোনো কিছুই বোঝানো যায় না। তাই বড়োদের জন্য নাটক নির্মাণ সহজে করা গেলেও, ছোটোদের জন্য নাটক নির্মাণ অনেক কষ্টসাধ্য। নির্দেশক আফজাল হোসেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বটি যথাযথভাবেই পালন করে যাচ্ছেন।

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'চ্যানেল আই' প্রযোজনাটি নিয়ে বেশ আন্তরিক। তারা নাটকটির প্রচারণার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা আনার চেষ্টা করছে। পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট, টিভি বিজ্ঞাপন, এমনকি রাজপথে র‍্যালি করে তারা শিশুদের এ ধারাবাহিকটি দেখতে উৎসাহিত করছে। ধারাবাহিকটির আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিবারই বাংলাদেশের এককেটি ঐতিহ্যবাহী জায়গার নামে নাটকের নামকরণ করা হয়। পাশাপাশি সে জায়গাটির দর্শনীয় স্থানগুলো কাহিনির সাথে সঙ্গতি রেখে পর্দায় উপস্থাপন করা হয়। এতে শিশুরা দেশ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠে। বিনোদনের পাশাপাশি শিশুদের দেশের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনের সাথে পরিচিত করার মাধ্যমে নির্দেশক একটি প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছেন।

ভালো এবং পরিশ্রমী যে-কোনো কাজে সফলতা ধরা দিবেই। ছোটকাকুও সে সফলতার মুখ দেখছে। ছোটকাকু এ সফলতার হাত ধরেই ছোটো পর্দা থেকে এখন বড়ো পর্দায় পা বাড়িয়েছে। এখানেও নির্দেশক আফজাল হোসেন। আমাদের প্রত্যাশা ছোটো পর্দার মতো বড়ো পর্দাতেও ছোটকাকু তাদের সফলতা ধরে রাখুক। জয়তু আফজাল হোসেন আর ফরিদুর রেজা সাগর।

একজন অন্যরকম বন্ধু

ফাইয়াজ কবির মুগ্ধ

আজকে আমাদের স্কুলের শিক্ষক আমাদেরকে 'দুই বন্ধু ও ভাল্লুক' গল্পটা শোনালেন। আমি অবশ্য গল্পটা আগেই শুনেছিলাম। গল্পটা শোনানোর পর Teacher আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা কখনো বিপদের সময় বন্ধুদের একা রেখে চলে যাবে না। আর কালকে সবাই এমন একজন বন্ধুর কথা লিখে আনবে যে তোমাদের কোনো না কোনো উপকার করেছে। আর তারপর তা পুরো ক্লাসকে 'পড়ে শোনাবে।' এটাই তোমাদের কালকের বাড়ির কাজ আর এটার উপর তোমাদের এ সপ্তাহে পুরস্কার দেওয়া হবে।' আমাদের স্কুলে প্রতি সপ্তাহে যে কোনো একটা সৃজনশীল বিষয়ে লিখতে দেওয়া হয়। আর তারপর যে সবচেয়ে ভালো লিখে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার বাড়ির কাজ পাওয়ার পর সবাই বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। কারণ আগে বিষয়গুলো খুব সহজ ছিল। যেমন- গত সপ্তাহের বিষয় ছিল 'তোমার বাবা' এর আগের সপ্তাহে ছিল 'তোমার প্রিয় শিক্ষক'। আমি সারাদিন ধরে চিন্তা করতে লাগলাম কী নিয়ে লিখব। বিপদে পড়লে তো আমরা সবাই সবাইকে সাহায্য করি। যেমন- গতকাল আমার কলমের কালি শেষ হওয়ার পর সাইমন আমাকে কলম দিয়েছিল। আবার কয়েকদিন আগে জাহিদ পড়ে ব্যথা পাওয়ার পর আমি, পার্থ, সাইমন, সিফাত সবাই ওকে সাহায্য করেছিলাম। জাহিদ বলেছে ও নাকি এ ঘটনাটাই লিখবে বাড়ির কাজ হিসেবে।

পরের দিন ক্লাসে সবাই সুন্দর করে তাদের উপকারী বন্ধুদের কথা লিখে আনল। আর একজন একজন করে সবাই পড়ে শোনালো। আমিও আমার উপকারী বন্ধুর কথা পড়ে শোনালাম। আমি লিখেছি গাছকে নিয়ে। গাছই তো আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের যোগান দেয় যা গ্রহণ করে মানুষ বেঁচে থাকে। গাছ মানুষকে ফল দেয়, ফুল দেয়, ছায়া দেয়। গাছ থেকে আমরা আসবাবপত্র তৈরির জন্য কাঠ পাই। বিভিন্ন গাছ থেকে ঔষধও তৈরি করা হয়। তারা ঔষধিগাছ নামে পরিচিত। গাছ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে, পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাহলে গাছই তো আমাদের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। যে আমাদের সবসময় উপকার করে। কিন্তু কোনো ক্ষতি করে না। আমার শিক্ষক-ও আমার লেখা দেখে খুব খুশি হয়। আর এ সপ্তাহে আমি সবচেয়ে ভালো লিখেছি বলে আমাকে একটা সুন্দর গোলাপ গাছ উপহার দেয়। আমার গাছ খুবই পছন্দ। আমার বাসায়ও অনেক গাছ আছে। লেবু গাছ, মরিচ গাছ, মানিপ্লান্ট, সন্ধ্যামালতী, গোলাপ গাছ, নিমগাছ। নিমগাছটা গত বছর 'নবারুণ' থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছিল। ইশ! সবাই যদি 'নবারুণ' ও শিক্ষক এর মতো গাছ উপহার দিত তাহলে কতই না মজা হত।

তৃতীয় শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়।

কামিনী গাছ ও কবুতর

নবনিল আহমেদ

আমি প্রতিদিন মাঠে খেলতে নামি। হঠাৎ দেখলাম একটি কবুতর মাটিতে পড়ে আছে। ও ডানায় ব্যথা পেয়েছে। তাই উড়তে পারছিল না। অনেক কুকুর ওকে হামলা করার জন্য যাচ্ছিল।

আমি ওর কাছে গেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো সরে গেল। আমি ওকে বাঁচালাম। তারপর আমি কবুতরটাকে বাসায় এনে রাখলাম। আমার যত্নে ওর ডানা ভালো হয়ে গেল। আমি গল্প লিখে একটি কামিনী গাছ উপহার পেলাম। কবুতরকে আমি গাছের পাশে রাখি। কবুতর গাছের পাশে থেকে অনেক আনন্দ পায়।

দ্বিতীয় শ্রেণি, রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ

মন ভালো করা গাছ

মো. সাজিদ হোসেন

রফিক সাহেব একা একা থাকে। সে সবসময় খুব দুঃখী থাকে। সে একটা গাছ কিনল। গাছটি ছিল পেয়ারা গাছ। সারাদিন সে গাছটির দেখাশুনা করেন। আস্তে আস্তে গাছটি বড়ো হতে থাকল। সে একদিন দেখল গাছটিতে ফুল ধরেছে। ফুল থেকে ছোটো ছোটো পেয়ারা হলো। গাছটি ছিল তার বাসার ছাদে। একদিন রাতে খুব ঝড় হলো। ঝড়ের মধ্যে তার গাছটির জন্য চিন্তা হচ্ছিল। তাই গাছটাকে দেখতে ছাদে গেল। দেখল গাছটির কিছু পাতা ছিঁড়ে পড়েছে। সে খুশি হলো কারণ তার গাছটির বেশি কিছু হয়নি। সে ঝড়ের ভয়ে গাছটিকে বাসার ভেতরে আনল। পরদিন সকালে গাছটিকে আবার ছাদে রেখে আসল। এদিকে গাছের পেয়ারাগুলো বড়ো হচ্ছে এবং অনেক ডালপালাও হয়েছে। একদিন খুব রোদ। সে ছাদে গিয়ে গাছটির নিচে বসল। দেখল সেখানে তার খুব আনন্দ লাগছে। সে আনন্দে গাছ থেকে একটা পেয়ারা ছিঁড়ে খেল এবং চারপাশের পরিবেশ দেখতে লাগল। রফিক সাহেবের মনে হলো পরিবেশে খুব কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তারপর সে ছাদে আরো গাছ লাগালো। একদিন তার খুব অসুখ হলো। সে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার বলল বেশি বেশি ফলমূল খেতে। সে বাড়ি ফিরে নিজের হাতে লাগানো গাছের তাজা ফল খেয়ে সুস্থ হয়ে গেল।

বন্ধুরা, গত বছর নবারুণ আড্ডায় এসেছিলাম। তখন নবারুণ অফিস আমাকে একটি পেয়ারা গাছ দিয়েছিল। সে গাছটিকে আমি আর আম্মু মিলে খুব যত্ন করছি। কিন্তু গাছটিতে এখনো পেয়ারা ধরেনি। মনে হয় তাড়াতাড়ি পেয়ারা হবে। হলে তোমাদের খাওয়াবো।

পঞ্চম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া শাখা

বঙ্গবন্ধু

ফাহিম আসাদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর নাম
আছে সর্বত্র তাঁহার সুনাম,
তিনি আমাদের জাতির পিতা
তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা।

তিনি বাংলার দীপ্ত অঙ্গীকার
নদনদী যেমন বহমান,
তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
শেখ মুজিবুর রহমান।

সপ্তম শ্রেণি, শের-ই-বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা।

গাছ

মো. হাসিবুর রহমান শিহাব

সবুজময় বাংলাদেশ
গড়তে যদি চাও
বাসাবাড়ি সবখানেতে
বেশি করে গাছ লাগাও।

পরিবেশ রক্ষা করতে
গাছের বিকল্প নাই
গাছের থেকে জীবন বাঁচানো
অক্সিজেন পাই।

চলো সবাই সারি সারি
গাছের বাগান করি
ফল বাগান, ফুল বাগান
ঔষধি বাগান গড়ি।

৭ম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

রঙিন ফুলে প্রজাপতি

মু. আহনাফ সিদ্দিক

রঙিন ফুলে প্রজাপতি
পাখনা মেলে ওড়ে,
ফুলের কাছে মধু খেতে
মৌমাছিরা ঘোরে।
রেললাইনে ঝাক ঝাকা ঝাক
রেলগাড়ি যে চলে,
রাতের বেলায় চাঁদ উঠেছে
খোকাখুকি বলে।

দ্বিতীয় শ্রেণি, গলাটিপা মডেল স. প্রা. বি., গলাটিপা, পটুয়াখালী।

স্বাস্থ্য

গাছ বন্ধু অসুস্থ হলে করণীয়

নবারুণের বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই ভালো আছো। শুধু নিজে ভালো থাকলে মন ভালো হয় না। বন্ধুরা যদি কেউ একজন অসুস্থ থাকে তাহলে মন খুব খারাপ হয়ে যায়। একদিন তুমি স্কুল থেকে বাসায় ফিরে দেখলে- তোমার গাছ বন্ধুদের মধ্যে বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাহলে মন খারাপ করে বসে না থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। হ্যাঁ আজ তোমাদেরকে আমগাছের রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানাবো।

গাছ বন্ধু অসুস্থ হলে সঠিক সময়ে রোগ ও পোকামাকড় দমন করে বন্ধুকে সুস্থ করতে হবে। এসব রোগ ও পোকামাকড় দমনের জন্য সঠিক বালাইনাশক বা ছত্রাকনাশক ওষুধ সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারলে অবশ্যই গাছ বন্ধু সুস্থ হয়ে যাবে।

আমের পোকা : হপার পোকা

হপার পোকা বা শোষক পোকা আমগাছের কচি অংশের রস চুষে খেয়ে বেঁচে থাকে। আমের মুকুল বের হওয়ার সাথে সাথে এরা মুকুলকে আক্রমণ করে। আমের মুকুল থেকে রস খেয়ে ফেলে। ফলে মুকুল শুকিয়ে ঝরে পড়ে, একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুন রস শোষন করে খায় এবং দেহের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়। যা মধুরস বা হানিডিউ নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে। মধুরসে এক প্রকার ছত্রাক জন্মায়। এই ছত্রাক জন্মানোর কারণে মুকুল, ফুল ও পাতার উপরে কালো রঙের স্তর পড়ে; যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এই পোকার আক্রমণে শুধু আমের উৎপাদনই কমে যায় না, গাছে বৃদ্ধিও কমে যেতে পারে।

দমন পদ্ধতি

১. গাছের মুকুল আসার কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ দিন আগে পুরো গাছ সাইপারমেথ্রিন বা কার্বারিল গ্রুপের যে-কোনো কীটনাশক দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

২. হপার পোকা অন্ধকার বা বেশি ছায়াযুক্ত স্থান পছন্দ করে তাই নিয়মিতভাবে ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। যাতে গাছের মধ্যে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে।

৩. আমের মুকুল যখন ১০ থেকে ১৫ সে.মি. হয় অর্থাৎ ফুল ফোটার আগে একবার এবং আম যখন মটর দানাকৃতি হয় তখন আর একবার প্রতিলিটার পানিতে ১ মিলিলিটার হারে সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি, ডেসিস ২.৫ ইসি কার্বারিল, ইমিডাক্লোরোপিড, সাইহ্যালাথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক ভালোভাবে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ স্প্রে করতে হবে।

৪. আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড বা ঝুল রোগের আক্রমণ ঘটে। রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক হপার পোকা দমনের জন্য ব্যবহার্য। কীটনাশকের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

যে-কোনো গাছের রোগবালাই ও চিকিৎসার জন্য তোমরা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে তোমরা উপকৃত হবে। প্রয়োজনে উপজেলা বনবিভাগ থেকে যে-কোনো ফুল বা ফলের চারা সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রতিবেদন : জামাল উদ্দিন

নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য

বালিকারা আর বধূ হবে না

বগুড়া ব্রিগেডের শপথ

বগুড়ার যমুনা তীরের ধুনট পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে না করার শপথ নিয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে নেওয়া এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২২ মে স্কুল চত্বরে উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া সুলতানাসহ উপজেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে, কোনো অবস্থাতেই তারা বালিকা বধূ হবে না। কেউ যদি নির্ধারিত বয়সের আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বলে তাহলে সহপাঠিদের সঙ্গে প্রশাসনের কাছে গিয়ে সহযোগিতা চাইবে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। প্রয়োজনে প্রতিটি গ্রামে গিয়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে বালিকাদের নিয়ে ব্রিগেড গঠন করা হবে বলে তারা ঘোষণা দেয়। তারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। এ কাজে তারা মুরুব্বিদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়।

শপথ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বালিকাদের কাছে অঙ্গীকার করেন, বালিকাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর চেষ্টা করা হলে কোনোভাবে সেই খবরটি তাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন, এমনকি রাতে হলেও। দরকার হলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজকরা মিডিয়াকে জানায়, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের কাউন্সিলিং করবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির প্রায় ৪শত শিক্ষার্থী এ শপথ নেয়।

বাল্যবিবাহ মুক্ত সিলেট বিভাগ

হাজারো ছাত্রী ও অভিভাবকের শপথের মধ্যদিয়ে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হলো সিলেট বিভাগকে। ২৪ মে সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের উদ্যোগে নগরীর রিকাবিবাজার কাজী নজরুল অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমা বেগম এ ঘোষণা দেন।

সিলেট বিভাগকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা উপলক্ষে এর আগে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বাল্যবিবাহ ঠেকাতে বিভিন্ন স্লোগান (যেমন বাল্যবিবাহ আর নয়, কন্যাশিশুর হবে জয়) সংবলিত ফেস্টুন নিয়ে অংশ নেয়।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল সিলেট জেলাকে।

প্রতিরোধে পুরুষদের সম্পৃক্ত করলে নির্যাতন কমে

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি)-এর এক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, নারী/কিশোরী নির্যাতন প্রতিরোধে নারীর পাশাপাশি পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে, দলীয় আলোচনার সুযোগ থাকলে এবং দলের সদস্যারা সক্রিয় হলে কিশোরীদের ক্ষেত্রে স্বামীর মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতনের ঝুঁকি ২১ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। ১৭ মে আইসিডিডিআরবির সাসাকাওয়া মিলনায়তনে এক সেমিনারে এই গবেষণার ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ঢাকা শহরের বস্তি এলাকায় ২০১০ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্য গ্রোয়িং আপ সেফ অ্যান্ড হেলথ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০ থেকে ২৯ বছর বয়সি নারীদের ৫১ শতাংশ এবং ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সি পুরুষদের ১৫ শতাংশকে দলের অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ফলে নারীদের ক্ষেত্রে তেমন আশানুরূপ ফল পাওয়া না গেলেও কিশোরী মেয়েরা স্বামীর শারীরিক নির্যাতনের হার কমাতে সক্ষম হয়।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

বাবা দিবস ও শিশুতোষ চলচ্চিত্র

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা কী জানো, মা দিবসের মতো বাবা দিবসও আছে? হ্যাঁ,বাবা দিবস। প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে বাবা দিবস পালন করা হয়। সে হিসেবে এ বছর বাবা দিবস ১৮ জুন। বাবা একজন মানুষ। যে মানুষটিকে ঘিরে থাকে আমাদের নানান আবদার, ভালোবাসা, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি। বাবা হলেন আমাদের জন্মদাতা। বাবা হলেন আলো,যার আলোয় আমাদের সারাজীবনের পথচলা। মূলত বাবার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জানানোর জন্য এ দিবস। যদিও বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা প্রতিদিনই।

চলো বন্ধুরা জেনে নিই কীভাবে বাবা দিবস এল। 'বাবা দিবস' পালন শুরু হয় গত শতাব্দীর প্রথমদিকে। ১৯১০ সালে সোনোরা স্মার্ট ডোড নামের এক তরুণীর মাথা থেকে প্রথম বাবা দিবসের ধারণাটা আসে । আমেরিকার ওয়াশিংটনের স্পোকান শহরে সোনোরা লুইস ডডের মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে হঠাৎ মারা যায়। তখন ডডের বয়স ছিল ১৬ বছর। আর ডডের বাবা উইলিয়াম জ্যাকসন সবেমাত্র যুদ্ধ থেকে ফিরেছে। তারপর থেকে ডড দেখেছে তার বাবা ছয় ভাই- বোনকে মানুষ করার জন্য রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তাদের স্বার্থে সে আর বিবাহ করেনি। বাবা তাদেরকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। যেন বাবাই তাদের মা। বাবাই ছিল তাদের সবকিছু। সেই বছর 'মা দিবস' নিয়ে গির্জায় ভালো ভালো কথা শুনছিলেন তিনি। তখনই 'বাবা দিবস' ঘোষণার বিষয়টি সোনোরের চিন্তায় আসে। তখন তার মনে হয়েছিল শুধু মা নয়, বাবা নিয়েও এরকম একটি দিন থাকলে ভালো হয়। আর ঐ বছরেই তিনি বাবা দিবস পালন করেন। বন্ধুরা বাবাকে নিয়ে, বাবার আদর-স্নেহ নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় বেশ কিছু বিখ্যাত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। বাবা দিবসে তোমরা চাইলে বাবার সাথে এসব চলচ্চিত্র উপভোগ করতে পারো।

এবার চলো বন্ধুরা, 'বাবা' নিয়ে নির্মিত কিছু বিখ্যাত চলচ্চিত্র সম্পর্কে জেনে নিই।

লাইক ফাদার, লাইক সন

জাপানিজ ভাষায় নির্মিত এ চলচ্চিত্রে বাবা-ছেলে সম্পর্কের এক অন্যরকম মাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। হাসপাতালে ভুলবশত দুই দম্পত্তির দুই সন্তান জন্মের

পর অদল-বদল হয়ে যায়। কয়েক বছর পর এটা তারা জানতে পারে। তারপর দুই পরিবার কী করল? সন্তানেরা কী তাদের আসল বাবা-মা'য়ের কাছে ফিরে যায়? জানতে হলে তোমাদের অবশ্যই চলচ্চিত্রটি দেখতে হবে।

দ্যা পারসুইট অব হ্যাপিনেস

ক্রিস গার্ডনার একজন সেলসম্যান। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে এক সময় তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়। ক্রিসের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যান। তাদের পাঁচ

বছরের একটি সন্তান থাকে। শুরু হয় ক্রিসের সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই। সন্তানের প্রতি বাবার অগাধ ভালোবাসার চিত্র উঠে এসেছে এই চলচ্চিত্রে। বাবা-ছেলের ভালোবাসার এই চলচ্চিত্রটি দেখতে ভুল করো না কিন্তু।

পা

হিন্দি ভাষায় নির্মিত জনপ্রিয় একটি চলচ্চিত্র 'পা' (বাবা)। ঔরো ১২ বছর বয়েসি একটি বুদ্ধিমান ছেলে। জেনেটিক সমস্যার কারণে তাকে দেখতে বয়স্ক লাগে। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় ঔরোর বাবা-মা আলাদা হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে ঔরোর সাথে তার বাবার পরিচয় হয়। ঔরোর বাবাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। ঔরো বাবা-মাকে মিল করানোর চেষ্টা করে।ঔরো কী পারে মিল করাতে? জানতে হলে দেখতে হবে চমৎকার চলচ্চিত্রটি।

কোলিয়া

লউকা একজন অবিবাহিত বাদ্য বাজানেওয়ালা। একসময় সে অনেক ঋণী হয়ে হয়ে যান এবং চাকরি হারান। এরই মাঝে ৫ বছরের শিশু কোলিয়ার সাথে তার পরিচয় হয়। তারপর শিশুটিকে অনেক ভালোবাসতে থাকে লউকা।বাবা না হয়েও বাবার দায়িত্ব পালনের এক উজ্জ্বল রূপ উঠে আসে এ চলচ্চিত্রে। তারপর ঘটতে থাকে একের পর এক চমৎকার ঘটনা। আর এগুলো দেখতে তোমাদের দেখতে হবে 'কোলিয়া' ছবিটি।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

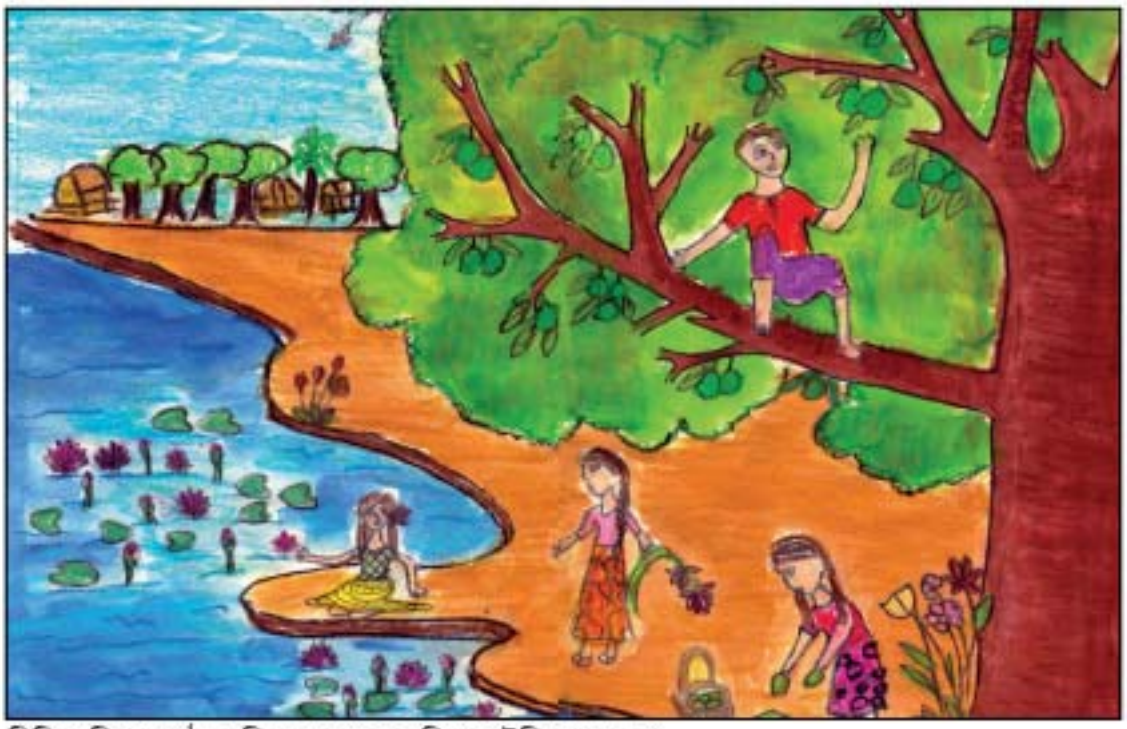

বিন্তি প্রতিকা, ষষ্ঠ শ্রেণি মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল ঢাকা

আয়ান হক ভূঁঞা, বয়স ৪ বছর

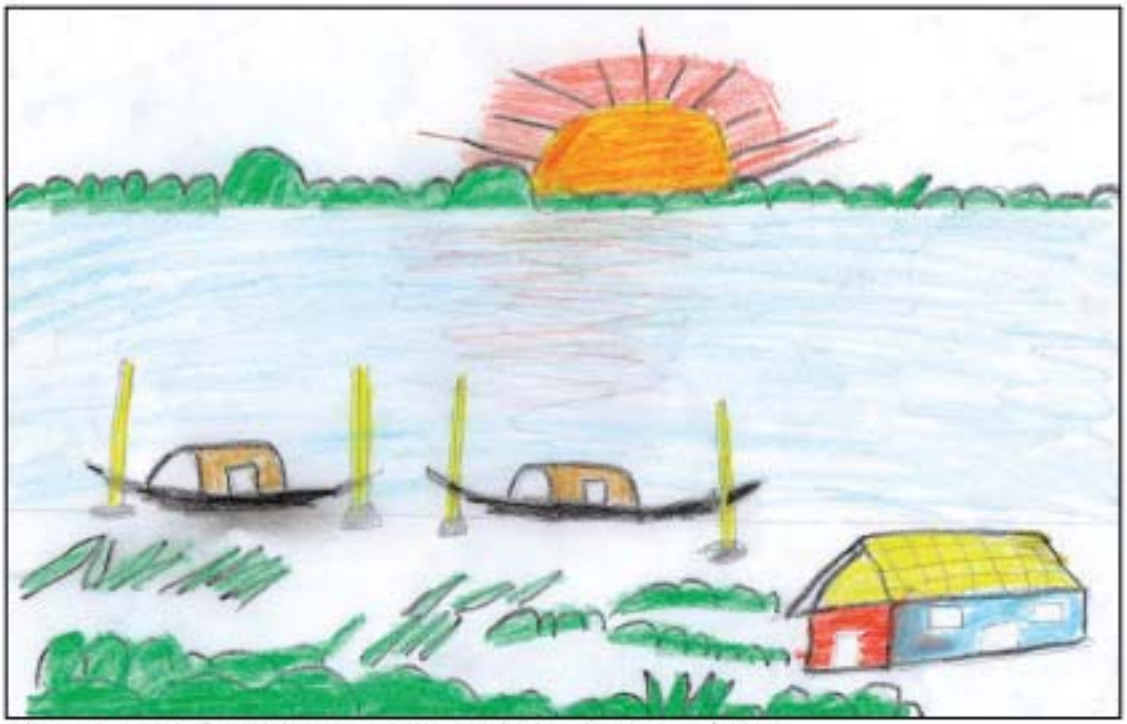

নিখিল দাস, চতুর্থ শ্রেণি, রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর

ফাতিম তাহানান, প্রথম শ্রেণি, আল খিদমা মহিলা মাদরাসা

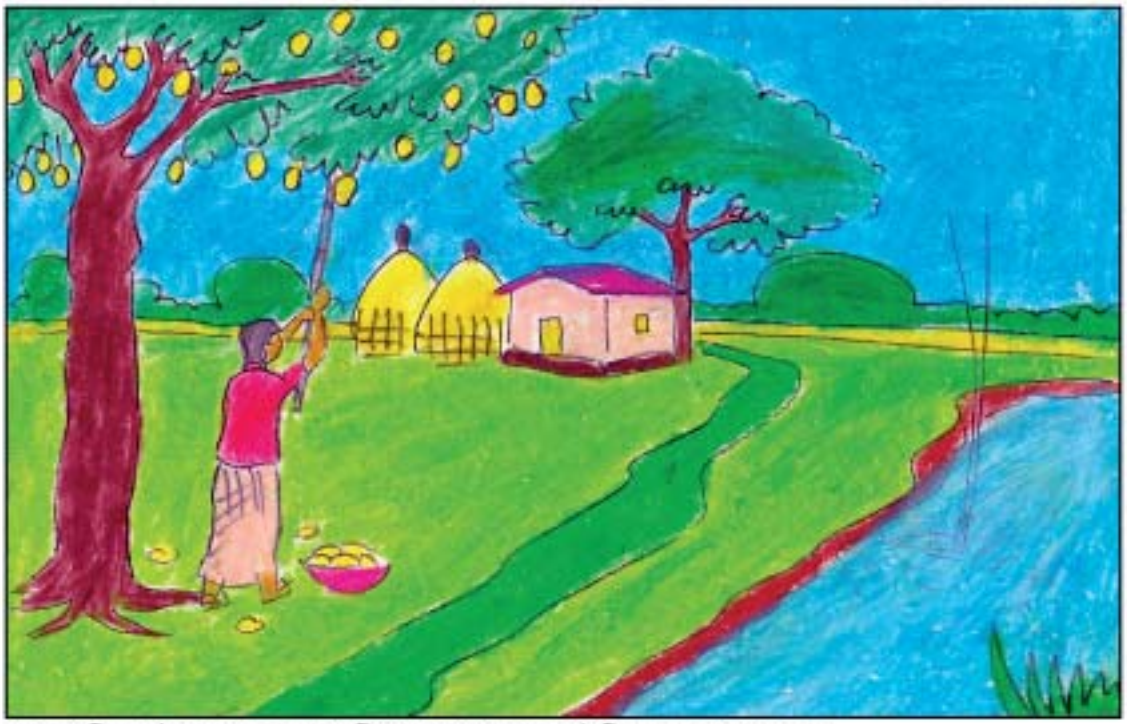

মো. রাকিবুল ইসলাম, নবম শ্রেণি, পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ

কাজী আরাফাত রহমান, ষষ্ঠ শ্রেণি, মিতালি বিদ্যাপীঠ, স্বামীবাগ, ঢাকা

নাজিবা সায়েম, পঞ্চম শ্রেণি, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

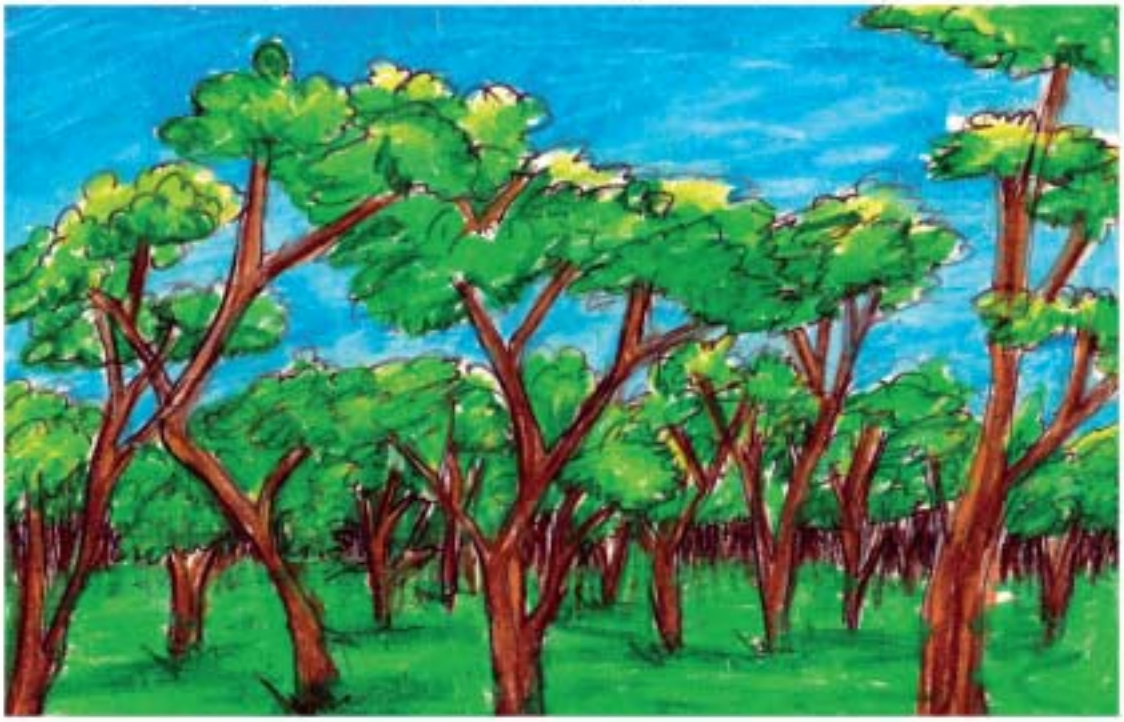

মো. সিনদিদ হোসেন, নবম শ্রেণি, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, মালিবাগ, ঢাকা